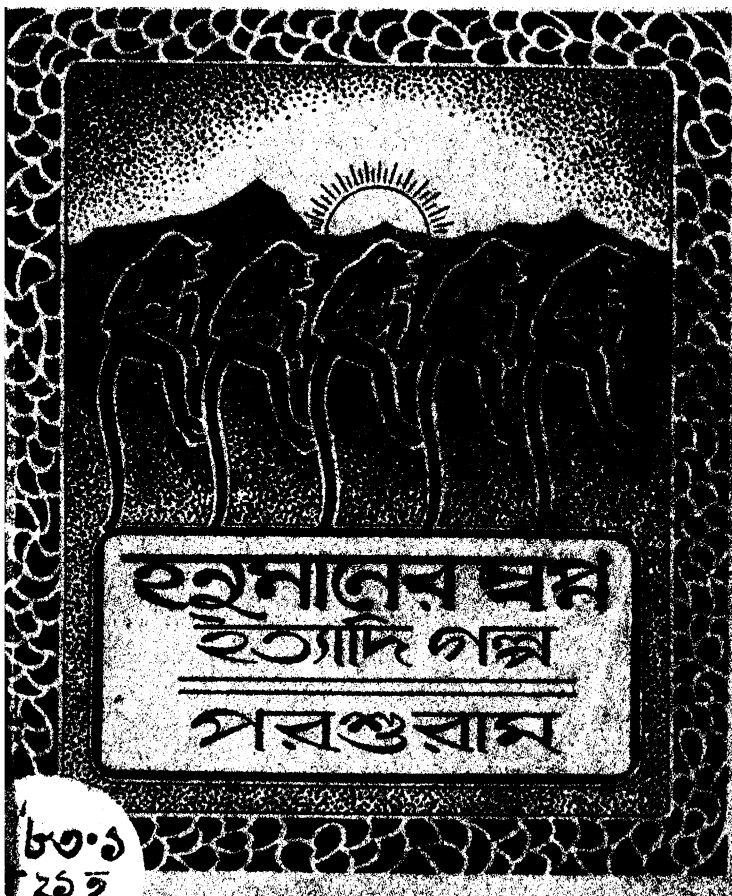

হনুমানের স্বপ্ন
ইত্যাদি গল্প
পরশুরাম

হনুমানের স্বপ্ন

ইত্যাদি গল্প

পরশুরাম

শ্রীযতীন্দ্রকুমার সেন বিচিত্রিত



এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স, লিঃ
১৪, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

প্রকাশক
সুপ্রিয় সরকার
১৪, কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা

চতুর্থ সংস্করণ, মাঘ, ১৩৫৫

মূল্য আড়াই টাকা

এমারেল্ড প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ লিঃ, ৮।১।১, ল্যান্সডাউন রোড,
কলিকাতা হইতে শ্রীনারায়ণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত

গল্প

চিত্র



হনুমানের স্বপ্ন

রাম রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অপ্রতিহতপ্রভাবে রাজ্যশাসন ও অপত্যনির্বিশেষে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। কোশলরাজ্য শান্তির ও স্বাস্থ্যের নিলয় হইল, প্রজার গৃহ ধনধান্যে ভরিয়া উঠিল, তস্কর, বঞ্চক ও পণ্ডিত-মূর্খগণ বৃত্তিনাশহেতু পলায়ন করিল। দেশে আর্ত পীড়িত নাই, ধর্মাধিকরণে বাদী প্রতিবাদী নাই, কারাগার জনশূন্য।

ভিষগ্‌গণ রোগীর অভাবে ভোগীর পরিচর্যায় নিযুক্ত হইলেন, বিচারকগণ পরস্পরের ছিদ্রান্বেষণে রত হইয়া অবসর-বিনোদন করিতে লাগিলেন।

হনুমান্ এখন অযোধ্যাতেই বাস করেন। রাম তাঁহার জন্য এক সুরম্য কদলীকাননে সপ্ততল কাষ্ঠভবন নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। মহাবীর তথায় পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন এবং ভক্ত প্রজাবর্গের সমাদরে সর্বাঙ্গীণ পরিপুষ্টি লাভ করিলেন।

কিন্তু কয়েক মাস পরেই তাঁহার ভাবান্তর লক্ষিত হইল। অযোধ্যাবাসী উদ্‌বিগ্ন হইয়া দেখিল পবননন্দন দিন দিন কৃশ হইতেছেন, তাঁহার কান্তি ম্লান হইতেছে, তাঁহার আর তেমন স্ফূর্তি নাই। রামের আদেশে রাজ-বৈদ্যগণ হনুমানের চিকিৎসা করিলেন, বিস্তর অরিষ্ট মোদক রসায়নাদির ব্যবস্থা হইল, কিন্তু কোনও উপকার দর্শিল না। ভিষগ্‌গণ হতাশ হইয়া বলিলেন, মহাবীরের যে ব্যাধি তাহা আধ্যাত্মিক, ঔষধে সারিবার নয়। অগত্যা বশিষ্ঠ ঋষি হনুমানের মঙ্গলকামনায় এক বিরাট যজ্ঞের উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন।

তখন রাজ্ঞী সীতা হনুমান্‌কে রাজান্তঃপুরে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'বৎস, তোমার কি হইয়াছে প্রকাশ করিয়া বল, আমি তোমার মাতৃতুল্য, বলিতে সংকোচ করিও না।'

হনুমানের স্বপ্ন

মহাবীর কিয়ৎক্ষণ তাঁহার বাম গ্রীবা কণ্ডুয়ন করিলেন, তাহার পর দক্ষিণ গ্রীবা কণ্ডুয়ন করিলেন। তদনন্তর মস্তক নত করিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন—'মাতঃ, আমার গোপন কথা যদি নিতান্তই শুনিতে চাও তবে না বলিয়া উপায় নাই। কিছুদিন পূর্বে আমি স্বপ্নে পিতৃগণকে দেখিয়াছি। তাঁহারা সুমেরুশিখরে সারি সারি পা ঝুলাইয়া বসিয়া আছেন এবং বিষণ্ণবদনে নিজ নিজ উদরে হাত বুলাইতেছেন। এই দুঃস্বপ্নের অর্থ আমি বশিষ্ঠপুত্র বামদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, হে মহাবীর, ও কিছু নয়, তোমার পিতৃগণ ক্ষুধিত হইয়াছেন, তুমি কদলী দগ্ধ করিয়া শ্রাদ্ধ কর এবং ব্রাহ্মণগণকে ভূরিদক্ষিণা দাও। আমি রামদেবের উপদেশ পালন করিলাম, কিন্তু তাহার পর আবার পিতৃগণ আমাকে স্বপ্নে দর্শন দিলেন। তখন আমার জ্ঞান হইল যে তাঁহারা ক্ষণিক ব্যবস্থায় তৃপ্ত হইবেন না। আমার মৃত্যুর পর কে তাঁহাদিগকে পিণ্ড দিবে? লোকে যে-বয়সে বিবাহ করিয়া গার্হস্থ্যধর্ম পালন করে, আমি সেই বয়সে সুগ্রীবের অনুচর হইয়া বানপ্রস্থে কালহরণ করিয়াছি। এখন প্রভু রামচন্দ্রের কৃপায় সুগ্রীব রাজ্যলাভ করিয়াছেন, রাবণ বিনষ্ট হইয়াছে, আমারও অবসর মিলিয়াছে। কিন্তু আমি এখন বার্ধক্যের দ্বারদেশে উপস্থিত, এখন যদি দার-পরিগ্রহ করিয়া গৃহী হইতে চাই তবে লোকে আমাকে

ধিক্‌কার দিবে। হা, আমার পিতৃঋণ শোধের কি উপায় হইবে? হে দেবি, এই দুশ্চিন্তা আমাকে অহরহ দহন করিতেছে, আমি নিরন্তর পিতৃগণের ম্লান মুখ ও শূন্য উদর দেখিতে পাইতেছি, আমার ক্ষুধা নাই নিদ্রা নাই শান্তি নাই।' এই বলিয়া হনুমান্ নীরবে অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন।

হনুমানের বচন শুনিয়া দেবী জানকী ঈষৎ হাস্য-সহকারে কহিলেন 'হে বীরশ্রেষ্ঠ, এজন্য আর চিন্তা কি? তুমি লোকলজ্জায় অভিভূত হইও না, এই দণ্ডে বিবাহ করিয়া পিতৃগণকে নিশ্চিন্ত কর। তোমার কী এমন বয়স হইয়াছে? আমার পূজ্যপাদ শ্বশুর মহাশয় তোমার অপেক্ষাও অধিক বয়সে ভরতজননীকে গৃহে আনিয়াছিলেন। আমি আমার সখীগণকে ডাকিয়া আনিতেছি, তাহারা সকলেই সুরূপা সুশীলা সদ্‌বংশীয়া। তোমার যাহাকে ইচ্ছা পত্নীত্বে বরণ কর। হে কপিপ্রবর, আমি নিশ্চয় কহিতেছি এই অযোধ্যায় এমন কন্যা নাই যে তোমাকে পতিরূপে পাইয়া ধন্য হইবে না। তুমি তোমার জাতির জন্য কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইও না। আমি অনুরোধ করিলে মহর্ষি বশিষ্ঠ উপনয়নসংস্কার দ্বারা তোমাকে ক্ষত্রিয় বানাইয়া দিবেন। অথবা যদি মানবীতে তোমার অভিরুচি না থাকে তবে কিষ্কিন্ধ্যায় গমন কর এবং একটি পরমা সুন্দরী বানরীর

পাণিগ্রহণ করিয়া সত্বর অযোধ্যায় ফিরিয়া আইস। তোমার পত্নীর নাম যাহাই হউক আমি তাহাকে হনুমতী বলিব এবং এই রাজপুরীর বধূগণমধ্যে সাদরে গ্রহণ করিব।'

তখন হনুমান্ প্রফুল্ল হইয়া কহিলেন 'জনকনন্দিনি, তোমার জয় হউক। আমি কৌলীন্য ভঙ্গ করিব না, বানরীই বিবাহ করিব এবং শ্রীরামচন্দ্রের অনুমতি লইয়া অদ্যই কিষ্কিন্ধ্যা যাত্রা করিব।

হনুমান্ নানা গিরি নদী বনভূমি অতিক্রম করিয়া দণ্ডকারণ্যে উপস্থিত হইলেন। তখন অপরাহ্ণ, সূর্যাস্তের বিলম্ব নাই। মহাবীর এক বিশাল শাল্মলিতরুর শাখায় বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন এবং চতুর্দিকে চাহিয়া দেখিলেন নিকটে কোথাও রাত্রিবাসের উপযুক্ত আশ্রয় আছে কিনা। সহসা অদূরে একটি সুবৃহৎ পর্ণগৃহ নয়নগোচর হইল। হনুমান্ বৃক্ষ হইতে নামিয়া সেই গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন তাহার অভ্যন্তর পরিপাটীরূপে সজ্জিত। ভূমিতে কোমল তৃণরাশির উপর মসৃণ মৃগচর্মের আস্তরণ, এক কোণে স্তূপীকৃত সুপক্ক আম্র-পনস-রম্ভাদি ফল, অন্য কোণে চন্দনকাষ্ঠের মঞ্চের উপর রাজোচিত বসন উত্তরীয় উষ্ণীষ প্রভৃতি পরিচ্ছদ এবং বিবিধ প্রসাধনদ্রব্য, প্রাচীর-গাত্রে লম্বিত একটি সুরম্য পরিবাদিনী বীণা।

হনুমান্ সমস্ত নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া সহর্ষে কহিলেন—'অহো, নিশ্চয়ই স্বর্গস্থ পিতৃগণ আমার প্রতি স্নেহবশে এই উপহারসামগ্রী প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রীতির নিমিত্ত আমি এখনই এই পরিচ্ছদ ধারণ করিব এবং রাত্রিকালে এই উপাদেয় ভোজ্যসকল আহার করিব।'

এই বলিয়া হনুমান্ সেই বিচিত্র বসন-উত্তরীয়াদি পরিধান করিলেন এবং মস্তকে উষ্ণীষ স্থাপন করিয়া অতিশয় শোভমান হইলেন। তাহার পব শয্যায় উপবেশন করিয়া ভাবিলেন—'এখনও বেলা অবসান হয় নাই, ভোজনেব বিলম্ব আছে, ততক্ষণ আমি এই বীণা বাজাইয়া দেখি।'

মহাবীর সাবধানে বীণাটি পড়িলেন, কিন্তু বাদ্যেব উপক্রম করিতেই তাঁহার প্রবল অঙ্গুলিস্পর্শে সমস্ত তার ছিঁড়িয়া গেল। হনুমান্ বিরক্ত হইয়া বলিলেন—'এই ক্ষণভঙ্গুর যন্ত্র মাদৃশ বীরের অস্পৃশ্য।' তখন তিনি মৃগচর্মে শয়ান হইয়া ভাবী ভার্যার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

তাঁহার কান্তা কেমন হইবে? তন্বী না স্থূলা, পিঙ্গলবর্ণা না রক্তকপিশপ্রভা, ধীরা না চপলা, কলকণ্ঠী না কর্কশনাদিনী? ভাবিতে ভাবিতে সহসা তাঁহার চিত্তে নির্বেদ উপস্থিত হইল। হনুমান্ স্বগত কহিতে লাগিলেন—'অহোবত, আমি এ কী ঘোর কর্মে ব্যবসিত হইয়াছি! আমি সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়াছি,



'ওরে বানরাধম'

লঙ্কা দগ্ধ করিয়াছি, গন্ধমাদন উৎপাটিত করিয়াছি। সাগরে অম্বরে পর্বতে অরণ্যে আমার অজ্ঞাত কিছু নাই। আমি সমরে অভিজ্ঞ, সংকটে ধীর, দেবচরিত্র কাকচরিত্র আমার নখদর্পণে। কিন্তু স্ত্রীজাতির রহস্য আমি কি-ই বা জানি! এই অদ্ভুত প্রাণীর গুম্ফ নাই শ্মশ্রু নাই বল নাই বুদ্ধি নাই। অথচ দেখ ইহারা শিশুকে স্তন্যদান

করে কিন্তু আমরা তাহা পারি না। ইহারা অকারণে হাস্য করে, অকারণে ক্রন্দন করে, তুচ্ছ মুক্তা প্রবাল ইহাদের প্রিয়, সন্তানপালন ও নিরর্থক বস্তুসংগ্রহই একমাত্র কার্য। ঈদৃশী কোমলাঙ্গী মসৃণবদনী পয়স্বিনী শিশুপালিনী ভার্যার সহিত আমি কিরূপ ব্যবহার করিব? যদি সে আমার প্রিয়কার্য করে তবে কি মস্তকে উত্তোলন করিয়া সমাদর করিব? যদি অবাধ্য হয় তবে কি চপেটাঘাতে বিনীত করিব? বানরধর্মশাস্ত্রে এবংবিধ শাসনের বিধান আছে বটে, কিন্তু মানবশাস্ত্র কি বলে?

হনুমান্ এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এমন সময় সেই পর্ণগৃহের দ্বারদেশে এক সুদর্শন যুবা পুরুষের আবির্ভাব হইল। তাঁহার বেশভূষা বহুমূল্য, স্কন্ধ হইতে শরাসন লম্বিত, পৃষ্ঠে তূণীর, এক হস্তে বাণবিদ্ধ দশটি তিত্তির পক্ষী, অন্য হস্তে একটি সদ্য আহৃত বৃহৎ মধুচক্র।

আগন্তুক হনুমান্‌কে দেখিয়া ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া বলিলেন—'ওরে বানরাধম, তুই কোন্ সাহসে আমার রাজবেশ আত্মসাৎ করিয়া আমার শয্যায় শুইয়া আছিস? দাঁড়া, এখনই তোকে যমালয়ে পাঠাইতেছি।'

হনুমান্ কহিলেন—'ওহে বীরপুংগব, তিষ্ঠ তিষ্ঠ। হঠকারিতা মূর্খের লক্ষণ, ধীর ব্যক্তি অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা

করিয়া কার্য করেন। আমি রামদাস হনুমান্, লোকে আমাকে মহাবীর বলে। ইহার অধিক পরিচয় অনাবশ্যক।'

তখন আগন্তুক সসম্ভ্রমে ললাটে যুক্তকর স্পর্শ করিয়া কহিলেন 'অহো, আমার কি সৌভাগ্য যে শ্রীহনুমানের দর্শন লাভ করিলাম! মহাবীর, তুমি অজ্ঞানকৃত অপরাধ ক্ষমা কর। আমি তুম্বদেশের অধিপতি, নাম চঞ্চরীক। তোমার যোগ্য সংকার করি এমন আয়োজন আমার এই অরণ্যকুটীরে নাই। যদি কোনও দিন আমার রাজপুরীতে পদরেণু দাও তবেই আমার তৃপ্তি হইবে। হে অঞ্জনানন্দন, তুমি ঐ রমণীয় পরিচ্ছদ উষ্ণীষাদি খুলিয়া ফেলিতেছ কেন, উহাতে তোমাকে সাক্ষাৎ কন্দর্পের ন্যায় দেখাইতেছে। আমি এই রজতময় দর্পণ ধরিতেছি একবার অবলোকন কর। তুমি অনুমতি দাও, আমি এই সুস্বাদু তিত্তিরমাংস অগ্নিপক্ব করিয়া দিতেছি। তুমি বুঝি নিরামিষাশী? তবে ঐ আম্র-পনস-রম্ভাদি দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি কর। হে মারুতি, তুমি বিমুখ হইও না, একবার মুখব্যাদান কর, আমি এই মধুচক্র তোমার বদনে নিংড়াইয়া দিই। তুমি বোধ হয় সংগীতচর্চা করিতেছিলে, তাই আমার বীণাটির এমন দশা হইয়াছে। হে মহাবীর, তুমি বুঝি কার্মুক ভাবিয়া উহাতে টংকার দিয়াছিলে?'

হনুমান্ কহিলেন,—"চঞ্চরীক, তোমার অভ্যর্থনায় আমি

প্রীত হইয়াছি। কিন্তু তুমি অধিক বাচালতা করিও না, আমার এই বজ্রমুষ্টি দেখিয়া রাখ, ইহা হঠাৎ ধাবিত হয়। এই পরিচ্ছদে আমি অস্বস্তি বোধ করিতেছি, তুমিই ইহা পরিধান করিও। আমার আহারের জন্য ব্যস্ত হইও না, যথাকালে তাহা হইবে। তোমার বীণা কোনও কর্মের নয়। দুঃখ করিও না, আমি উহাতে শণের রজ্জু লাগাইয়া দিব। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি কি জন্য বিজন অরণ্যে এই কুটীর নির্মাণ করিয়াছ? যদি নরপতি হও, তবে তোমার গজ বাজী অনুযাত্র সৈন্য দেখিতেছি না কেন? তোমার রথ সারথি কোথায়, বিদূষকই বা কোথায়?'

চঞ্চরীক কহিলেন 'হে বানরর্ষভ, আমি মনের দুঃখে একাকী অরণ্যবাস করিতেছি, এখন আমিই আমার রক্ষী, আমিই সারথি, আমিই বিদূষক। আমার কাহিনী অতি করুণ, শ্রবণ কর। আমার মহিষী পরমরূপবতী এবং অশেষগুণশালিনী, কিন্তু তাঁহাকে ঠিক পতিব্রতা বলিতে পারি না। একদা আমি তাঁহার এক সুন্দরী সখীর সহিত কিঞ্চিৎ রসচর্চা করিতেছিলাম, দুরদৃষ্টক্রমে তিনি তাহা দেখিয়া ফেলেন। এই তুচ্ছ কারণে তিনি বাক্যালাপ বন্ধ করিয়া ক্রোধাগারে বসতি করিয়াছেন। আমিও তাঁহাকে জব্দ করিবার মানসে এই অরণ্যে বাস করিতেছি এবং পশুপক্ষী মারিয়া বিরহযন্ত্রণা লাঘব করিতেছি। হে পবন-

নন্দন, এখন আমার দৃঢ় ধারণা হইয়াছে যে একা ভার্যা অশেষ অনর্থের মূল। শাস্ত্র যথার্থই বলিয়াছেন অল্পে সুখ নাই, ভূমাতেই সুখ। শুনিয়াছি এই অরণ্যে মহাতপা লোমশ মুনি বাস করেন। নারীজাতিকে বশে রাখিবার উপায় তিনি সম্যক্ অবগত আছেন, কারণ তাঁহার একশত পত্নী। আমি স্থির করিয়াছি তাঁহাকে গুরুত্বে বরণ করিব। আমার কথা সমস্ত বলিলাম, এখন তুমি কি জন্য অযোধ্যা ত্যাগ করিয়া এখানে আসিয়াছ শুনিতে ইচ্ছা করি। রামচন্দ্র কি পূর্বোপকার বিস্মৃত হইয়া তোমার অনাদর করিয়াছেন?'

হনুমান্ কহিলেন 'সাবধান, তুমি রামনিন্দা করিও না। আমি কিষ্কিন্ধ্যায় যাইতেছি, সেখানে দারপরিগ্রহ করিয়া বধূর সহিত অযোধ্যায় ফিরিব। তোমার উপর আমার প্রীতি জন্মিয়াছে, অতএব মনের কথা খুলিয়া বলি। হে চঞ্চরীক, আমি স্ত্রীতত্ত্ব অবগত নহি, কেবল পিতৃ-ঋণ পরিশোধের নিমিত্তই এই দুরূহ সংকল্প করিয়াছি। তোমার দাম্পত্যকাহিনী শুনিয়া আমার চিত্ত সংশয়াকুল হইয়াছে।'

চঞ্চরীক হাস্য করিয়া কহিলেন 'হে হনুমন্, ভয় নাই। তুমি যখন গন্ধমাদন বহন করিয়াছ তখন ভার্যার ভারও বহিতে পারিবে। আমি তোমাকে সমস্তই শিখাইয়া দিব। সম্প্রতি কিছু সারগর্ভ উপদেশ দিতেছি শ্রবণ কর। পুত্রার্থে ভার্যা করা অতি সহজ কর্ম, কিন্তু যদি প্রেমের জন্য ভার্যা

করিতে হয় তবে স্ত্রীচরিত্রে অভিজ্ঞতা আবশ্যক। নিজস্ত্রী সলজ্জা হইবে এবং পরস্ত্রী নির্লজ্জা হইবে ইহাই রসজ্ঞজনের কাম্য। তোমার রামরাজ্যের কথা অবগত নহি, কিন্তু সংসারে এই শুভসমন্বয় কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। অতএব --'

হনুমান্ কহিলেন 'ওহে চঞ্চরীক, তুমি ক্ষান্ত হও। অগ্রে নিজ সমস্যার সমাধান কর তাহার পর আমাকে উপদেশ দিও। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে, এখন ভোজনের আয়োজন করিতে পার। কুটীরদ্বার বন্ধ করিয়া দাও, বনভূমির শীতবায়ু আর আমার তেমন সহ্য হয় না।'

চঞ্চরীক অর্গল বদ্ধ করিয়া প্রদীপ জ্বালিলেন এবং ভোজনের উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন। সহসা দ্বারে করাঘাত করিয়া কে বলিল 'ভো গৃহস্থ, অর্গল মোচন কর, আমি শীতার্ত ক্ষুধার্ত অতিথি।'

চঞ্চরীক দ্বার উদ্‌ঘাটন করিলে এক শীর্ণকায় তপস্বী গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার মস্তক জটামণ্ডিত, শ্মশ্রু আজানুলম্বিত, দেহ লোমে সমাকীর্ণ।

চঞ্চরীক প্রণাম করিয়া কহিলেন --'তপোধন, আপনাকে দেখিয়াই চিনিয়াছি যে আপনি স্বনামধন্য লোমশ ঋষি। আপনার দর্শনলাভের জন্য আমরা ব্যগ্র হইয়াছিলাম,

আপনি বোধ হয় যোগবলে জানিতে পারিয়া কৃপাবশে স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছেন। আমি তুম্বরাজ চঞ্চরীক, আর ইনি আমার পরমবন্ধু জগদ্‌বিখ্যাত মহাবীর হনুমান্‌। এই কপিপ্রবর দারপরিগ্রহের নিমিত্ত কিষ্কিন্ধ্যায় যাইতেছেন, কিন্তু সহসা ইঁহার চিত্ত সংশয়াকুল হইয়াছে। আমার অবস্থাও ভাল নয়। আমার একটি ভার্যা আছেন বটে, কিন্তু আমি বৈচিত্র্যের পিপাসু, ভূমার আস্বাদ লইতে আমার অত্যন্ত বাসনা হইয়াছে। হে ঋষিশ্রেষ্ঠ, শুনিয়াছি দাম্পত্য-তত্ত্বে আপনাব জ্ঞানের পরিসীমা নাই। আপনার জন্য এই পক্ষিমাংস শূলপক্ক করিয়া দিতেছি, আপনি ততক্ষণ কিঞ্চিৎ সৎপরামর্শ দিন।'

ইত্যবসরে মহর্ষি লোমশ একটি অতিকায় পনস ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া তাহার সুপক্ক কোষসকল ক্ষিপ্রহস্তে বদনে নিক্ষেপ করিতেছিলেন। এখন ভোজন সমাপ্ত করিয়া কহিলেন 'পবননন্দন চিরজীবী হও, তুম্বরাজ তোমার জয় হউক। এখন আমি কিঞ্চিৎ সুস্থ বোধ করিতেছি। অষ্টাহ-কাল আমার আহার নিদ্রা নাই, আমি গৃহচ্যুত, কৌপীনমাত্র সম্বল।'

শরাসনে ঝটিতি জ্যারোপণ করিয়া চঞ্চরীক কহিলেন 'প্রভো, কোন্‌ দুরাচার রাক্ষস আপনার আশ্রম লুণ্ঠন করিয়াছে? অনুমতি দিন, এই দণ্ডে তাহাকে বধ করিব। আহা,

আপনার সকল পত্নীই কি অপহৃতা হইয়াছেন? মহাবীর, অবাক্ হইয়া ভাবিতেছ কি? গাত্রোত্থান কর, আবার তোমাকে সাগরলঙ্ঘন করিতে হইবে। বিভীষণকে ছাড়িয়া দিয়া ভাল কর নাই।'

লোমশ কহিলেন 'তোমরা ব্যস্ত হইও না, আমার ইতিহাস শ্রবণ কর। পূর্বে এই দক্ষিণাপথে দ্বাদশবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার প্রতিকারকল্পে শতজন নরপতি আমার শরণপন্ন হন। তাঁহাদের রাজ্যের হিতার্থে আমি এক বিরাট্ যজ্ঞের অনুষ্ঠানদ্বারা সুবৃষ্টি আনয়ন করি। কৃতজ্ঞ নরপতিগণ দক্ষিণাস্বরূপ তাঁহাদের শতকন্যা আমাকে সম্প্রদান করেন এবং ভরণপোষণের যথোচিত ব্যবস্থাও করেন। আমি এই রাজনন্দিনীগণের বাসের নিমিত্ত আমার তপোবনে এক শত গৃহ নির্মাণ করিয়া দিয়াছি।'

চঞ্চরীক জিজ্ঞাসিলেন 'মুনিবর, আপনার তপোবনে ক্রোধাগার আছে তো?'

লোমশ কহিলেন 'প্রত্যেক গৃহই ক্রোধাগার। হত-ভাগিনীগণ নিরন্তর কলহ করে, তাহাদের গৃহকর্ম নাই, পতিসেবা নাই, ব্রতপূজা নাই। আমি আদর করিয়া তাহাদের প্রথমা দ্বিতীয়া ইত্যাদিক্রমে নবনবতিতমী শততমী পর্যন্ত নাম রাখিয়াছি, কিন্তু তাহারা পরস্পরকে মূষিকা চর্মচটিকা পেচকী ছুছুন্দরী প্রভৃতি ইতর নামে সম্বোধন করে

এবং আমাকে ভল্লুক বলে। আমি উত্ত্যক্ত হইয়া পলায়ন করিয়াছি, এখন সেই ব্যাপিকাগণ যত ইচ্ছা কলহ করুক। হে রাজন্, তুমি কি ভূমার আস্বাদ চাও? তবে আমার আশ্রমে যাও। শ্রীহনুমান্‌ও তথায় পত্নীনির্বাচন করিতে পারিবেন। আমি আর সেখানে ফিরিতেছি না। এখন এই বৃদ্ধ বয়সে আমি শান্তি চাই এবং আর একটি বিবাহ করিয়া এক পত্নীর যে সুখ তাহাই উপলব্ধি করিতে চাই।'

লোমশ মুনির বচন শুনিয়া হনুমান্ কিয়ৎক্ষণ হতভম্ব হইয়া রহিলেন। তাহার পর প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিলেন — 'হে তপোধন, প্রণিপাত করি, হে চঞ্চরীক, তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হউক। এখন বিদায় দাও, আমি সুগ্রীবের নিকট চলিলাম।'

চঞ্চরীক ব্যস্ত হইয়া কহিলেন 'সে কি! এই গভীর রজনীতে অরণ্যপথে কোথায় যাইবে? অন্তত প্রভাত পর্যন্ত এখানে বিশ্রাম কর।'

হনুমান্ কর্ণপাত করিলেন না।

কিষ্কিন্ধ্যার এক সুরম্য উপবনে নল নীল গয় গবাক্ষ প্রভৃতি মিত্রগণের সহিত বসিয়া বানররাজ সুগ্রীব নারিকেল ভক্ষণ করিতেছিলেন এমন সময় হনুমান্ আসিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন।

সুগ্রীব রাজোচিত গাম্ভীর্য সহকারে কহিলেন—'মহাবীর, কি মনে করিয়া ? আমি এখন রাজকার্যে ব্যস্ত আছি, অবসর নাই, অন্য কালে তোমার বক্তব্য শুনিব।'

হনুমান্ কহিলেন 'হে বানরাধিপ, আমি এক বিশেষ প্রয়োজনে তোমার সাহায্যপ্রার্থী হইয়া আসিয়াছি।'

সুগ্রীব কহিলেন 'কিষ্কিন্ধ্যায় তোমার সুবিধা হইবে না। তোমার অরণ্যসম্পত্তি যাহা ছিল সমস্তই অঙ্গদ-বাবাজী দখল করিয়াছেন, ফিরিয়া পাইবার আশা নাই। আমারও এখন অত্যন্ত অভাব চলিতেছে, তোমাকে কিছু দিতে পারিব না। অযোধ্যা ছাড়িলে কেন ? ফিরিয়া গিয়া তোমার প্রভু রামচন্দ্রকে নিজ প্রার্থনা জানাও, তিনি অবশ্যই একটা বিহিত করিবেন। রাঘব তো মন্দ লোক নহেন।'

হনুমান্ কহিলেন 'ওহে সুগ্রীব, তোমার চিন্তা নাই। আমি পূর্বসম্পত্তি চাহি না, তোমার রাজ্যের ভাগও চাহি না, প্রভু রামচন্দ্রের কৃপায় আমার কোনও অভাব নাই। আমি বিবাহ করিবার জন্য এখানে আসিয়াছি। কিন্তু এই অনভ্যস্ত ব্যাপারে আমি সংশয়ান্বিত হইয়াছি, তুমি সৎপরামর্শ দাও।'

সুগ্রীব তখন প্রীত হইয়া কহিলেন--'হে সুহৃদ্‌বর, তোমার সংকল্প অতিশয় সাধু। এতক্ষণ বাজে কথা বলিতেছিলে কেন ? ঐ সুকোমল বৃক্ষশাখায় উপবেশন কর, কিঞ্চিৎ নারিকেলোদক পান করিয়া স্নিগ্ধ হও। হে ভ্রাতঃ, আমি

সর্বদাই তোমার হিতকামনা করিয়া থাকি। কেবলই ভাবি, আহা, আমাদের হনুমান্ সংসারী হইল না! তুমি বিবাহের জন্য কিছুমাত্র চিন্তা করিও না, উহা অতি সহজ কর্ম। দেখ আমি অষ্টোত্তর-সহস্র ভার্যায় পরিবৃত হইয়া পরমানন্দে কালযাপন করিতেছি।'

হনুমান্ কহিলেন—'তুমি এই পত্নীপুঞ্জ শাসনে রাখ কি করিয়া? তাহারা কলহ করে না? তোমাকে বাক্যবাণে প্রপীড়িত করে না?

সুগ্রীব সহাস্যে কহিলেন—'সাধ্য কি। আমি কদলী-বল্কল দ্বারা তাহাদের ওষ্ঠাধর বাঁধিয়া রাখি, কেবল প্রেমালাপকালে খুলিয়া দিই। যাহা হউক, তোমার ভয় নাই। আপাতত তুমি একটিমাত্র পত্নী গ্রহণ কর, পরে ক্রমে ক্রমে সংখ্যা বৃদ্ধি করিও। আমি বলি কি—তুমি অন্যত্র চেষ্টা না করিয়া শ্রীমতী তারাকে বিবাহ কর, আমার আর তাঁহাকে প্রয়োজন নাই। তিনি প্রবীণা এবং পতি-সেবায় পরিপক্বা। তাঁহাকে লাভ করিয়া তুমি নিশ্চয় সুখী হইবে।'

হনুমান্ কহিলেন—'তুমি তারাদেবীর নাম করিও না, তিনি আমার নমস্যা।'

সুগ্রীব কহিলেন—'বটে! অযোধ্যায় থাকিয়া তোমার মতিগতি বিগড়াইয়াছে দেখিতেছি। আচ্ছা, তুমি আর এক

চেষ্টা করিতে পার। এই কিষ্কিন্ধ্যার দক্ষিণে কিচ্চট দেশ আছে। তাহার অধিপতি প্লবংগম অপুত্রক অবস্থায় লোকান্তর গমন করিয়াছেন, এখন তাঁহার দুহিতা চিলিম্পা রাজ্যশাসন করিতেছে। এই বানরী অতিশয় লাবণ্যবতী বিদুষী ও চতুরা। আমি বিবাহের প্রস্তাবসহ দূত পাঠাইয়াছিলাম, কিন্তু লাঙ্গুল কর্তন করিয়া চিলিম্পা তাহাকে বিদায় দিয়াছে। নল নীল গয় গবাক্ষ ইঁহারাও প্রেমনিবেদন করিতে তাহার কাছে একে একে গিয়াছিলেন, কিন্তু সকলেই ছিন্ন-লাঙ্গুল হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। এই দুর্বিনীতা বানরীর উপর আমার লোভ ও আক্রোশ উভয়ই আছে, কিন্তু আমার অবসর নাই, নতুবা স্বয়ং অভিযান করিয়া তাহাকে ধরিয়া আনিতাম। এখন তুমি যদি তাহাকে জয় কর তবে আমার ক্ষোভ দূর হইবে, তোমারও পত্নীলাভ হইবে।'

হনুমান্ কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন-- তাহাই হউক। আমি এখনই কিচ্চট দেশে যাত্রা করিতেছি।'

হনুমান্ কিচ্চটরাজ্যে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার বিশাল বপু দেখিয়া প্রজাগণ সভয়ে পথ ছাড়িয়া দিল এবং চিলিম্পাকে সংবাদ দিল—'হে রাজনন্দিনি, আর রক্ষা নাই, এক পর্বতাকার বীর বানর তোমার রাজ্য আক্রমণ করিয়াছে।'

চিলিম্পা কহিলেন—'ভয় নাই, অমন অনেক বীর দেখিয়াছি। তাহাকে ডাকিয়া আন।'

হনুমান্ এক মনোরম কুঞ্জবনে আনীত হইলেন। চিলিম্পা তথায় সখীগণে পরিবৃতা হইয়া বসিয়া আছেন, তাঁহার কর্ণে রক্তপ্রবাল, কণ্ঠে কপর্দমালা, হস্তে লীলা-কদলী। হনুমান্ মুগ্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন—'অহো, সুগ্রীব যথার্থই বলিয়াছেন। এই তরুণী বানরী পরমা সুন্দরী, ইহাকে দেখিবামাত্র আমার চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল, সংশয় দূর হইল। ইহাকে যদি লাভ করিতে না পারি তবে জীবনই বৃথা।'

ঈষৎ হাস্যে কুন্দদন্ত বিকশিত করিয়া চিলিম্পা কহিলেন—'হে বীরবর, তুমি কি-হেতু বিনা অনুমতিতে আমার রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছ? তুমি কে, কোথা হইতে আসিয়াছ, কি চাও, সমস্ত প্রকাশ করিয়া বল, আমি তোমাকে অভয় দিলাম।'

হনুমান্ উত্তর দিলেন—'হে প্লবংগম-নন্দিনী, আমি রামদাস হনুমান্, অযোধ্যা হইতে আসিয়াছি, তোমার পাণি-গ্রহণ করিয়া আবার অযোধ্যায় ফিরিতে চাই। আমিও তোমাকে অভয় দিতেছি।'

হনুমানের বাক্য শুনিয়া সখীগণ কিলকিলা রবে হাসিয়া উঠিল। চিলিম্পা কহিলেন—'হনুমন্, তোমার ধৃষ্টতা তো

কম নয়। তোমার কি এমন গুণ আছে যাহার জন্য আমার পাণিপ্রার্থী হইতে সাহসী হইয়াছ ?'

হনুমান্ কহিলেন—'আমি সেই রামচন্দ্রের সেবক যিনি পিতৃসত্য পালনের জন্য বনে যান, যিনি রাবণকে নিধন করিয়াছেন, যিনি দুর্বাদলশ্যাম পদ্মপলাশলোচন, যিনি সর্বগুণান্বিত লোকোত্তরচরিত।'

চিলিম্পা কহিলেন—'হে রামদাস, তুমি কি রামচন্দ্রের সম্বন্ধ করিতে আসিয়াছ ?'

হনুমান্ জিহ্বা দংশন করিয়া কহিলেন 'আমার প্রভু একদারনিষ্ঠ। জনকতনয়া সীতা তাঁহার ভার্যা, যিনি মূর্তিমতী কমলা, যাঁহার তুলনা ত্রিজগতে নাই। আমি নিজের জন্যই তোমার কাছে আসিয়াছি।'

চিলিম্পা কহিলেন—'তবে নিজের কথাই বল।'

হনুমান্ কহিলেন—'নিজের কীর্তি নিজে বলা ধর্মবিরুদ্ধ, কিন্তু পণ্ডিতগণের মুখে শুনিয়াছি শত্রু ও প্রিয়ার নিকট আত্মগৌরব কথনে দোষ নাই। অতএব বলিতেছি শ্রবণ কর। আমি সাগর লঙ্ঘন করিয়াছি, গন্ধমাদন উৎপাটিত করিয়াছি, ভগবান্ ভানুকে কক্ষপুটে রুদ্ধ করিয়াছি, এই দেখ স্ফোটকের চিহ্ন। আমি সাতলক্ষ রাক্ষস বধ করিয়াছি, রাবণের মস্তকে চপেটাঘাত করিয়াছি, তাহার রথচূড়া চর্বণ করিয়াছি, এই দেখ একটি দন্ত ভাঙিয়া গিয়াছে।'

চিলিম্পা কহিলেন—'হে মহাবীর, তোমার বচন শুনিয়া আমার পরম প্রীতি জন্মিয়াছে। কিন্তু স্ত্রীজাতি কেবল বীরত্ব চাহে না। তোমার কান্তগুণ কি কি আছে? তুমি নৃত্যগীত জান? কাব্য রচিতে পার?'

হনুমান্ কহিলেন—'অয়ি চিলিম্পে, রাবণবধের পর আমি অধীর হইয়া একবার নৃত্যগীতের উপক্রম করিয়াছিলাম; কিন্তু নল নীল প্রভৃতি বানরগণ আমাকে উপহাস করে, তাহাতে আমি নিরস্ত হই। সুমিত্রানন্দন তখন আমাকে বলেন—মারুতি, তুমি ক্ষুব্ধ হইও না। তুমি যাহা কর তাহাই নৃত্য, যাহা বল তাহাই গীত, যাহা না বল তাহাই কাব্য, ইতরজনের বুঝিবার শক্তি নাই।'

চিলিম্পা তাঁহার করধৃত কদলীগুচ্ছ লীলাসহকারে দংশন করিতে করিতে কহিলেন-'হে পবননন্দন, তুমি প্রেমতত্ত্বের কতদূর জান? তুমি কোন্ জাতীয় নায়ক? ধীরোদাত্ত, ধীরোদ্ধত, প্রশান্ত না ললিত? তুমি কি করিয়া আমার মনোরঞ্জন করিবে, কি করিয়া আমার মানভঞ্জন করিবে? আমি যদি গজমুক্তার হার কামনা করি তবে তুমি কোথায় পাইবে? যদি রাগ করিয়া আহার না করি তবে কি করিবে?'

হনুমান্ ভাবিলেন—'এই বিদগ্ধা বানরী এইবার আমাকে সংকটে ফেলিল, ইহার প্রশ্নের কি উত্তর দিব?

যাহা হউক, আমি অপ্রতিভ হইব না। হে সুন্দরী, তোমাকে দেখিয়া আমার চিত্ত চঞ্চল হইয়াছে, প্রেমতত্ত্বের ইহাই আমার প্রথম জ্ঞান। তুমি চিন্তা করিও না, কিষ্কিন্ধ্যা-পতি সুগ্রীব আমার অগ্রজতুল্য, তিনি আমাকে সমস্ত শিখাইয়া দিবেন। তুম্বরাজ চঞ্চরীক আমার বন্ধু, তিনিও আমাকে জ্ঞানদান করিবেন। তুমি যদি মুক্তাহার কামনা কর তবে জানকীর নিকট চাহিয়া লইব, যদি আহার না কর তবে এই লৌহকঠোর অঙ্গুলি দ্বারা তোমাকে খাওয়াইব। হে প্রিয়ে, আর বিলম্ব করিও না আমার সহিত চল। সীতা তোমার হনুমতী নাম দিয়াছেন, তিনি তোমাকে বরণ করিবার জন্য অযোধ্যায় প্রতীক্ষা করিতেছেন।'

চিলিম্পা তখন হনুমানের চিবুকে তর্জনীর মৃদু মৃদু আঘাত করিয়া মধুর স্বরে কহিলেন 'ওরে বর্বর, ওরে অবোধ, ওরে বৃদ্ধবালক, তুমি প্রেমের কিছুই জান না। যাও, কিষ্কিন্ধ্যায় গিয়া সুগ্রীবকে পাঠাইয়া দাও।'

হনুমান্ আকুল হইয়া কহিলেন 'অয়ি নিষ্ঠুরে, আমাকে আশা দিয়া নিরাশ করিতেছ কেন? আমি তোমাকে কিছুতেই ছাড়িব না।' এই বলিয়া তিনি চিলিম্পাকে ধরিবার জন্য বাহু প্রসারিত করিলেন।

চিলিম্পা করতালি দিয়া বিকট হাস্য করিলেন। সহসা বনান্তরাল হইতে কালান্তক যমের ন্যায় দুই মহাকায় নরকপি

নিঃশব্দে আসিয়া হনুমানকে অতর্কিতে পাশবদ্ধ করিল। চিলিম্পা কহিলেন- 'হে অরঙ্গ-অটঙ্গ, এই মর্কটের বড়ই স্পর্ধা হইয়াছে, দ্বাদশাঙ্গুল পরিমাণ ছাঁটিয়া দিয়া ইহাকে বিতাড়িত কর।'

তখন প্রত্যুৎপন্নমতি হনুমান্ প্রভঞ্জনকে স্মরণ করিলেন। নিমেষে তাঁহার দেহ হিমাদ্রিতুল্য হইল, পাশ শতচ্ছিন্ন হইল, প্রচণ্ড পদাঘাতে নরকপিদ্বয় সাগরগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইল। স্বর্গ মর্ত্য পাতাল প্রকম্পিত করিয়া মহাবীর উপ উপ রবে তিন বার সিংহনাদ করিলেন, তাহার পর চিলিম্পার কেশ গ্রহণ-পূর্বক 'জয় রাম' বলিয়া ঊর্ধ্বে লম্ফ দিলেন।

ঝঞ্ঝাবাহিত মেঘের ন্যায় হনুমান্ শূন্যমার্গে ধাবিত হইতেছেন। আকাশবিহারী সিদ্ধ-গন্ধর্ব-বিদ্যাধরগণ বলিতে লাগিল- -'হে পবনাত্মজ, এতদিনে তোমার কৌমার-দশা ঘুচিল, আশীর্বাদ করি সুখী হও।' দিগ্‌বধূগণ ছুটিয়া আসিয়া বলিল- -'হে অঞ্জনানন্দন, মুহূর্তের তরে গতি সংবরণ কর, আমরা নববধূর মুখ দেখিব।' হনুমান্ হুংকার করিলেন, গগনচারিগণ ভয়ে মেঘান্তরালে পলায়ন করিল, দিগ্‌বধূগণ দিগ্‌বিদিকে বিলীন হইল।



'হে প্রাণবল্লভ, আমি একান্ত তোমারই

চিলিম্পা কাতর কণ্ঠে কহিলেন 'হে মহাবীর, আমার কেশ ছাড়িয়া দাও, বড়ই লাগিতেছে। বরং আমাকে পৃষ্ঠে লও নতুবা বক্ষে ধারণ কর।'

হনুমান্ বলিলেন—'চোপ!'

চিলিম্পা বলিলেন—'হে প্রাণবল্লভ, আমি একান্ত তোমারই। হে অরসিক, তুমি কি পরিহাস বুঝিতে পার

নাই? আমি যে তোমা-বই আর কাহাকেও জানি না।'

হনুমান্ পুনরপি বলিলেন--'চোপ!'

নিম্নে কিষ্কিন্ধ্যা দেখা যাইতেছে। সুগ্রীব, স্বল্পতোয়া তুঙ্গভদ্রার গর্ভে অষ্টাধিক-সহস্র পত্নীসহ জলকেলি করিতেছেন।

হনুমান্ মুষ্টি উন্মুক্ত করিলেন। অব্যর্থ লক্ষ্য। বানরী ঘুরিতে ঘুরিতে সুগ্রীবের স্কন্ধে নিপতিত হইল।

ভারমুক্ত হইয়া হনুমান্ দ্বিগুণ বেগে ধাবিত হইলেন। পঞ্চবটী – জনস্থান – চিত্রকূট — প্রয়াগ — শৃঙ্গবের— অবশেষে অযোধ্যা।

সীতা সবিস্ময়ে বলিলেন---'একি বৎস! সংবাদ দাও নাই কেন? আমি নগরী সুসজ্জিত করিতাম, বাদ্যভাণ্ড প্রস্তুত রাখিতাম। হনুমতী কই?'

হনুমান্ অবনত মস্তকে বলিলেন 'মাতঃ, হনুমতীকে পাই নাই। আমি এক সামান্যা বানরী হরণ করিয়া সুগ্রীবকে দান করিয়াছি। হে দেবি, বিধাতা আমার এই বিশাল বক্ষে যে ক্ষুদ্র হৃদয় দিয়াছেন তাহা তুমি ও



'জয় সীতারাম !'

রামচন্দ্র পরিপূর্ণ করিয়া বিরাজ করিতেছ, দারাপুত্রের স্থান নাই।'

সীতা বলিলেন 'বৎস, পিতৃ-ঋণ শোধের কি করিলে ?'

হনুমান মস্তকে করাঘাত করিয়া বলিলেন—'অহো পাষণ্ড! আমি সে কথা ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। জননি, তুমি এই বর দাও যেন অমর হইয়া চিরকাল পিতৃগণের পিণ্ডোদক বিধান করিতে পারি।'

সীতা বলিলেন—'বৎস, তাহাই হউক।'

তখন হনুমান্ পরিতুষ্ট হইয়া বিশাল বক্ষ প্রসারিত করিয়া ভুজদ্বয় ঊর্ধ্বে তুলিয়া বজ্রনির্ঘোষে বলিলেন—'জয় সীতারাম!'

১৩৩৭

পুনর্মিলন

মহাকবি ভাস রচিত 'মধ্যম' নাটিকার আখ্যানভাগ কিঞ্চিৎ অদলবদল করিয়া বলিতেছি।

পঞ্চপাণ্ডব বিন্ধ্যাটবীতে মৃগয়া করিতে গিয়াছেন। মধ্যম পাণ্ডব একটু বেশী চঞ্চল ও দুঃসাহসিক, তাই দল হইতে ছিটকাইয়া পথভ্রষ্ট হইয়া বনমধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। সহসা একটি রাক্ষস তাঁহার সম্মুখে আসিয়া বলিল—'যুদ্ধং দেহি।'

রাক্ষসটি তরুণ, আষাঢ়ের সজলজলদতুল্য তাহার কান্তি, কণ্ঠস্বরে বাল্যের মধুরতা যৌবনের গাম্ভীর্য এখনও দ্বন্দ্ব করিতেছে। তাহাকে দেখিয়া ভীমের মনে যুগপৎ বীর ও বাৎসল্য রসের সঞ্চার হইল। বলিলেন—'অয়ে বালক, তোমার সঙ্গে আমি লড়িব না, বরং তোমার পিতাকে ডাক।'

রাক্ষস ঘাড় নাড়িয়া বলিল—'চাতুরী চলিবে না। হয় যুদ্ধ কর নতুবা পরাজয় স্বীকার করিয়া আমার সঙ্গে চল। আমার জননী ব্রতপালন করিয়া অভুক্তা আছেন, আজ

তাঁহার পারণা। একটি হৃষ্টপুষ্ট মনুষ্য আনিতে বলিয়াছেন। তোমাকে বেশ স্থূলকায় দেখিতেছি, তোমার দ্বারাই তাঁহার ক্ষুন্নিবৃত্তি হইবে।'

ভীমের কৌতূহল হইল। বলিলেন—'বেশ, চল।'

অনেক বনজঙ্গল গিরি নদী অতিক্রম করিয়া রাক্ষস ভীমকে একটি প্রকাণ্ড পর্বতগুহার দ্বারদেশে আনিল। ডাকিল—'মাতঃ, আহার্য উপস্থিত।'

ভিতর হইতে রাক্ষসী বলিল—'চিরজীবী হও বৎস, তোমাকে গর্ভে ধারণ করা সার্থক হইল।'

অতঃপর ভীম রোমাঞ্চিত হইয়া শুনিলেন রাক্ষসী তাহার এক চেটীকে বলিতেছে 'হঞ্জে, মনুষ্যটিকে বড় বড় কষিয়া কর্তন কর। উত্তমরূপে সিদ্ধ হইলে কিঞ্চিৎ গন্ধক স্ফোটন দিয়া সন্তলন করিয়া নামাইও। বক্ষস্থল ও বাহুদ্বয় ছেলের জন্য রাখিও, পদদ্বয় তোমার, মুণ্ডটি আমি খাইব।'

রাক্ষস বলিল 'মাতঃ, একবার বাহিরে আসিয়া দেখ কেমন শিকার আনিয়াছি।'

রাক্ষস বলিল—'ও আর দেখিব কি। সব মানুষই সমান, ভাল করিয়া রাধিলে কে ঋষি কে চণ্ডাল টের পাওয়া যায় না। আমার এখন সময় নাই, চুল বাঁধিতেছি।'

রাক্ষস বলিল 'চুল বাঁধা এখন থাকুক, একবার বাহিরে আসিয়া দেখ।'



'ছি ছি লজ্জায় মরি !'

পুত্রের নির্বন্ধাতিশয়ে রাক্ষসী গুহা হইতে নির্গত হইয়া বাহিরে আসিল। ভীমকে দেখিয়া চমকিত হইয়া জিহ্বা দংশন করিয়া কহিল—'ওমা, আর্যপুত্র যে! ছি ছি লজ্জায় মরি! ওরে উন্মাদ, ওরে ঘটোৎকচ, প্রণাম কর বেটা।'

ভীম বলিলেন—'কে ও, দেবী হিড়িম্বা? প্রিয়ে, আজ ধন্য আমি।'

রাক্ষসী কি খাইল ভাস তাহা লেখেন নাই।

১৩৩৬.

উপেক্ষিত

শহর ফতেহাবাদ, সময় অপরাহ্ণ। শাহজাদী জবরউন্নিসা দিলতোড়বাগ উদ্যানে একাকিনী বসিয়া আছেন। সমান্তরাল তরুশ্রেণীর শীর্ষে অস্তরাগ ঝিকমিক করিতেছে, ডালে ডালে হাজার বুলবুলের কাকলি, গোলাবের ফোয়ারায় রামধনুর রংবাহার, ফুলে ফুলে চারিদিক ছয়লাপ। শাহজাদীর হাতে একটি রবাব, তাহাতে তিনি কোমল গুঞ্জন তুলিয়া আপন মনে মদুস্বরে গাহিতেছেন। তাঁহার প্রিয় ব্যাঘ্র হেমকান্তি ফারুকশিয়র পদপ্রান্তে বসিয়া থাবা দিয়া তাল দিতেছে এবং মাঝে স্বামিনীর বিজাপুরী জরিদার লাল চটিজুতা চাটিতেছে।

সহসা একটি পুরুষ মূর্তির আবির্ভাব। গৌরবর্ণ বলিষ্ঠ দেহ, বক্রাগ্র দাড়ি, বহুমূল্য পরিচ্ছদ, কটিবন্ধে রত্নখচিত পিধানে নিহিত দামস্কসীয় তলবার। ইনিই সুবিখ্যাত কোফতা খাঁ, বাদশাহের সেনাপতি ও দক্ষিণহস্ত।

জবরউন্নিসা চমকিত হইয়া বলিলেন—'একি, কোফতা খাঁ, তুমি এখানে?



শাহাজাদী জবরউন্নিসা

সেনাপতি কহিলেন 'হাঁ সুন্দরী। আজ আমি একটা হেস্তনেস্ত করিতে চাই। তুমি বহুকাল আমকে ছলনা করিয়াছ, আজ জবান খুলিয়া বল আমাকে বিবাহ করিবে কি না।'

জবরউন্নিসা কন্দর্পচাপতুল্য তাঁহার ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন 'বেওকুফ, তুমি কাহার সঙ্গে কথা কহিতেছ? ছিলে নগণ্য কিজিলবাশ ক্রীতদাস, আজ বাদশাহের দয়ায় সেনাপতি হইয়াছ। বস্, ঐখানেই ক্ষান্ত হও, অধিক ঊর্ধ্বে নজর দিও না।'

কোফতা খাঁ যথোচিত ভীষণতা সহকারে একটি অট্টহাস্য হাসিলেন। বলিলেন 'শাহজাদী, কে তোমার পিতাকে তখ্‌তে চড়াইয়াছে? মারহাট্টার আক্রমণ কে বার বার রোধ করিয়াছে? কাহার অনুগ্রহে তোমার এই ভোগৈশ্বর্য, এই হীরাজহরত, এই লীলা-উদ্যান, এই হাজার-বুলবুল-মুখরিত বুস্তাঁ? ইন্‌শাল্লাহ্‌। জান, একটি অঙ্গুলির হেলনে সমস্ত ভূমিসাৎ করিতে পারি? আজ হিন্দুস্তানের প্রকৃত মালিক কে? তোমার অক্ষম পিতা, না এই মহাবীর রুস্তম-ই-হিন্দ্‌ কোফতা খান ফতে জঙ্গ্‌?

জবরউন্নিসা বলিলেন- 'কুত্তার গর্দানে লোম গজাইলেই সে সিংহ হয় না।'

সেনাপতি কহিলেন—'বিস্‌মিল্লাহ্‌! এ কথা আর কেহ বলিলে এই মুহূর্তে তাহাকে কতল করিতাম। কিন্তু তুমি আমার দিল গিরিফতার করিয়াছ, এবারকার মত মাফ করিলাম। যাহা হউক, এখনও বল তুমি আমার হৃদয়েশ্বরী হইবে কি না।'

জবরউন্নিসা মধুর হাস্য করিয়া বলিলেন— 'কোফতা খাঁ, তুমি কি কবি হাফেজের সেই বয়েতটি জান না?—কুকুর বার বার ঘেউ ঘেউ করে, কিন্তু সিংহী একবারই গর্জায়।'

ইহার পর কোন পুরুষই স্থির থাকিতে পারে না, বিশেষত সেই দারুণ মুঘল যুগে। কোফতা খাঁ হুংকার করিয়া কহিলেন 'ইল্‌হম্‌দলিল্লাহ্‌! শাহজাদী, তবে আল্লার নাম স্মরণ করিয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও।' কোষ হইতে সড়াক করিয়া অসি নির্গত হইল।

'কোফতা খাঁ, তুমি আমাকে নিতান্তই হাসাইলে!' এই বলিয়া শাহজাদী অন্যমনস্কভাবে গুনগুন করিয়া গাহিতে লাগিলেন 'চল্‌ চল্‌ চম্বেলীবাগ পর মেরা বাঘকো খিলাউংগি।'

অসহ্য। কোফতা খাঁর নিষ্ঠুর হস্তে তলবার ঝলকিয়া উঠিল। সহসা শূন্যে যেন সৌদামিনী খেলিল, একটি হিল্লোলিত কাঞ্চনকায়া নিমেষের তরে উৎক্ষিপ্ত হইয়া আবার ভূতলে পড়িল। একটু অস্ফুট আর্তনাদ, একটু ছটফটানি, তাহার পর সব শেষ।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হইতেছে। জবরউন্নিসা তখন যন্ত্রে ঝংকার তুলিয়া গাহিতেছেন— 'আয়সে বেদরদীকে পালে পড়ী হুঁ।' তাঁহার পোষা বাঘটি ভোজন সমাপ্ত করিয়া পরম তৃপ্তির সহিত স্বক্কণী পরিলেহন করিতেছে। তাহার

বাঁয়ে কোফতা খাঁর পাগড়ি, ডাহিনে ছিন্ন ইজার কাবা জোব্বা, সম্মুখে কিঞ্চিৎ হাড়।

১৩৩৬

উপেক্ষিতা

তিন নম্বর রোডোডেনড্রন রোড, বালিগঞ্জ। বাহিরে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে। ড্রইংরুমে পিয়ানোর কাছে উপবিষ্ট গরিমা গাঙ্গুলী, তাহার সম্মুখে ইজিচেয়ারে চটক রায়। ঘরে আসবাব বেশী নাই, কারণ গরিমার বাবার ঢাকায় বদলির হুকুম আসিয়াছে, অধিকাংশ জিনিস প্যাক হইয়া আগেই রওনা হইয়া গিয়াছে।

এই চটক ছেলেটি যেমন ধনী তেমনই মিষ্টভাষী বিনয়ী বাধ্য, চিমটি কাটিলেও টুঁ শব্দ করে না—যাহাকে বলে নারীর মনুষ্য অর্থাৎ লেডিজ ম্যান। না হইবে কেন, সে যে পাঁচ বৎসর বিলাতে থাকিয়া সেরেফ এটিকেট অধ্যয়ন করিয়াছে। এমন সুপাত্র আজকালকার বাজারে দুর্লভ। গরিমার পিতা-মাতা কলিকাতা ত্যাগের পূর্বেই কন্যাকে বাগ্‌দত্তা দেখিতে চান, তাই তাঁহারা যাত্রার পূর্বসন্ধ্যায় ভাবী দম্পতিকে বিশ্রম্ভালাপের সুযোগ দিয়া দোতলায় বসিয়া সুসংবাদের প্রতীক্ষা করিতেছেন।

কিন্তু আলাপ তেমন জমে নাই। গোটা-পনর গান শেষ করিয়া গরিমা তৃতীয়বার জানাইল -'কাল আমরা যাচ্ছি।'

চটক বলিল- 'ও।'

হায় রে, বিদায়বার্তার এই কি উত্তর! গরিমার কথা যোগাইতেছে না। অগত্যা বলিল 'সেই ভুটানী গজলটা গাইব কি?'

'নাঃ, এইবার ওঠা যাক।'

'সেকি হয়, আগে বৃষ্টি থামুক।'

চটক চেয়ারে বসিয়া নীরবে উশখুশ করিতে লাগিল। মিনিট-দুই পরে আবার বলিল 'এইবার উঠি।'

গরিমা ভাবিতেছিল, কবি বৃথাই লিখিয়াছেন 'এমন দিনে তারে বলা যায়।' এই বাদল সন্ধ্যা কি নিষ্ফল হইবে? চটকের কি হইল? কেন সে পালাইতে চায়? তাহার কিসের অস্বস্তি, কিসের অস্থিরতা? গরিমার মোহিনী শক্তি আজ তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না। সেই ভেটকি-মুখী বেহায়া মেনী মিত্তিরটা চটককে হাত করে নাই তো? হবেও বা, যা গায়ে পড়া মেয়ে! গরিমা তাহার কণ্ঠাগত ক্রন্দন গিলিয়া ফেলিয়া বলিল— 'আর একটু বসুন।'

কিন্তু চটক বসিল না। চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিয়া বলিল—'নাঃ, চললুম, গুডনাইট।'



দেহলতা এলাইয়া দিল

বৃষ্টির নিরবচ্ছিন্ন ঝমঝমানি ভেদ করিয়া চটকের মোটর গুঞ্জরিয়া উঠিল। গেল, যাহা বলিবার তাহা না বলিয়াই চলিয়া গেল – ভোঁপ, ভোঁপ – দূরে, বহু দূরে।

গরিমা কাঁদিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া চটকের পরিত্যক্ত

চেয়ারে দেহলতা এলাইয়া দিল। তাহার পরেই এক লাফ। ভীষণ সত্য সহসা প্রকট হইল। বেচারা চটক !

চেয়ারে অগনতি ছারপোকা।

১৩৩৬

গুরুবিদায়

বৈকালিক প্রসাধনের পর মানিনী দেবী একটি বড় আরশির সামনে দাঁড়াইয়া নিজের অঙ্গশোভা নিরীক্ষণ করিতেছেন, এমন সময় একজোড়া গোঁপের প্রতিবিম্ব তাঁহার কাঁধের উপর ফুটিয়া উঠিল।

উক্ত গোঁফের মালিক তাঁহার স্বামী রায় বংশলোচন ব্যানার্জি বাহাদুর জমিদার অ্যাণ্ড অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট বেলিয়াঘাটা। মানিনী একটি ছোট দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ঘাড় না ফিরাইয়াই বলিলেন—'কি সুখেই যে মোটা হচ্ছি!'

বংশলোচন রসিকতার চেষ্টা করিয়া বলিলেন—'কেন, সুখের কমটাই বা কি, অমন যার স্বামী!'

মানিনী যদি সামান্য পাড়াগেঁয়ে স্ত্রীলোক হইতেন তবে হয়তো বলিয়া ফেলিতেন—পোড়াকপাল অমন স্বামীর। কিন্তু তাঁহার বাক্‌সংযম অভ্যাস আছে, সেজন্য বলিলেন—'স্বামী তো খুবই ভাল, আমিই যে মন্দ।'

কথার ধারা গহন অরণ্যের দিকে মোড় ফিরিতেছে

দেখিয়া বংশলোচন নিপুণ সারথির ন্যায় বলিলেন—'কি যে বল তার ঠিক নেই। কিসের অভাব তোমার? হুকুম করলেই তো হয়।'

মানিনী এইবার স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—'বয়েস তো বেড়েই চলেছে, ধর্ম্মকর্ম্ম কিছুই হ'ল না।'

বংশলোচন বলিলেন- 'কেন, এই যে আর বৎসর গয়া কাশী বৃন্দাবন আগ্রা দিল্লি করে এলে?'

'ভারী তো, তার ফল আর কদ্দিন টিকবে। ইচ্ছে হয় মন্তরটন্তর নি।'

'তা বেশ তো, সে তো খুব ভাল কথা। আমি চাটুজ্যে মশায়ের সঙ্গে এখনই পরামর্শ করছি।'

কিন্তু বংশলোচনের মন বলিতে লাগিল যে কথাটি মোটেই ভাল নয়। ইঁহাদের বাইশ বৎসর ব্যাপী দাম্পত্য-জীবনে অসংখ্যবার প্রীতির শৃঙ্খল মেরামত করিতে হইয়াছে, কিন্তু বংশলোচনের প্রাধান্য এ পর্যন্ত মোটামুটি বজায় আছে। পত্নীর গুরুভক্তি যদি প্রবলা হইয়া ওঠে তবে স্বামীর আসন কোথায় থাকিবে? গুরু যদি কেবল অখণ্ডমণ্ডলাকারের পদটি দেখাইয়া দিয়া ক্ষান্ত হন তবে কোনও আপত্তির কারণ থাকে না। কিন্তু গুরু যদি নিজেই ঐ পদটি দখল করিয়া বসেন তবেই চিন্তার কথা। মুশকিল এই যে, ধর্মের ব্যাপারে ঈর্ষা অভিমান শোভা পায় না।

তবে এক হিসাবে তাঁহার পত্নীর এই নূতন শখটি নিরাপদ। মানিনী দেবী অত্যন্ত একগুঁয়ে মহিলা। যদি দেশের বর্তমান হুজুগের বশে তাঁহার পিকেটিং করিবার বা প্রভাত-ফেরি গাহিবার ঝোঁক হইত তবে বংশলোচনের মান-ইজ্জত অনারারি হাকিমি কোথায় থাকিত? তাঁহার মুরুব্বী ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবই বা কি বলিতেন? মোটের উপর দেশভক্তির চেয়ে গুরুভক্তিতে ঝঞ্ঝাট ঢের কম।

বংশলোচন বৈঠকখানায় আসিয়া তাঁহার অন্তরঙ্গগণের নিকট পত্নীর অভিলাষ ব্যক্ত করিলেন। বৃদ্ধ কেদার চাটুজ্যে মহাশয় বলিলেন 'বউমার সংকল্প অত্যন্ত সাধু, তবে একটি সদ্‌গুরু দরকার। তোমাদের পৈতৃক গুরুর কুলে কেউ বেঁচে নেই?'

বংশলোচন বলিলেন 'শুনেছি একটি গুরুপুত্তুর আছেন, তিনি থিয়েটারে আবদালা সাজেন।'

'রাধামাধব! আচ্ছা, আমাদের গুরুপুত্তুরটিকে একবার দেখলে পার। সেকেলে মানুষ, শাস্ত্রটাস্ত্র জানেন না বটে, কিন্তু পৈতৃক ব্যবসাটি বজায় রেখেছেন।'

উকিল বিনোদবাবু বলিলেন—'চাটুজ্যে মশায়, আপনি এখনও সত্যযুগে আছেন। আজকাল আর সেকেলে গুরুর

চলন নেই যিনি বছরে বার-দুই শিষ্যবাড়ি পায়ের ধুলো দেন আর পাঁচ সের চাল, পাঁচ পো চিনি, গোটা দশেক টাকা লাট্টু মার্কা থান ধুতিতে বেঁধে প্রস্থান করেন। এখন এমন গুরু চাই যাঁর চেহারা দেখলে মন খুশী হয়, বচন শুনলে প্রাণ আনচান করে।'

বংশলোচনের ভাগনে উদয় বলিল 'মামাবাবু যদি মামীকে মুরগি ধরাতেন তবে আর এসব খেয়াল হ'ত না। তাইজন্যেই তো আমার শাশুড়ী মন্তব নিতে পারছেন না।'

চাটুজ্যে বলিলেন 'ছাই জানিস উদো। উপেন পালের নাম শুনেছিস? সেবার মধুপুরে গিয়ে দেখলুম প্রকাণ্ড বাড়ি, দশ বিঘে বাগান, দশটা গাই, এক পাল মুরগি। রাজর্ষির চালে থাকেন, ঘরেব তরি-তরকারি, ঘরের দুধ, ঘরের মুরগি। সস্ত্রীক ধর্ম আচরণ করেন, সঙ্গে চার জন গুরু হামেহাল হাজির, নিজের দুজন, স্ত্রীর দুজন।'

উপযুক্ত গুরু কে আছেন এই লইয়া অনেকক্ষণ আলোচনা হইল। পর্বতবাসী সন্ন্যাসী, আশ্রমবাসী মহারাজ, স্বচ্ছন্দচারী লেংটাবাবা, বৈজ্ঞানিক মহাপুরুষ, উদারপন্থী আধুনিক সাধু অনেকের নাম উঠিল। কিন্তু মুশকিল এই, বংশলোচন যাঁহাকে উপযুক্ত অর্থাৎ নিরাপদ মনে করেন, গৃহিণীর হয়তো তাঁহাকে পছন্দ হইবে না।

এমন সময় বংশলোচনের শালা নগেন দোতলা হইতে

নামিয়া আসিয়া বলিল —'আপনারা আর মাথা ঘামাবেন না, দিদি গুরু ঠিক ক'রে ফেলেছেন।'

বংশলোচন ক্ষীণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন 'কে ?'

'বালিগঞ্জের খঞ্চিদং স্বামী। অ্যাসা সুন্দর গাইতে পারেন। চেহারাটিও তেমনি, বয়সে এই জামাইবাবুর চেয়ে কিছু কম হবে। শুনেছি ছেলেবেলা থেকেই একটা উদাস উদাস ভাব ছিল, টেনিস খেলতে খেলতে কতবার অজ্ঞান হয়ে পড়তেন। সংসারে যদ্দিন ছিলেন, নাম ছিল পরান সরকার। তারপর স্ত্রীবিয়োগ হতেই স্বামী হয়েছেন। এখন তাঁর প্রায় দু-শ শিষ্য, চার-শ শিষ্যা।'

'একবারে সব ঠিক হয়ে গেছে নাকি ?'

'উঁহু, দিদি তাতে চালাক আছেন। কাল স্বামীজীকে নিয়ে আসছি, এখানে হপ্তা-খানিক জাঁকড়ে থাকবেন, যাকে বলে প্রোবেশন। তারপর দিদির যদি ভক্তিটক্তি হয় তবে মন্তর নেবেন।'

চাটুজ্যে মহাশয় বলিবেন—'অতি উত্তম ব্যবস্থা। গুরু-টির সন্ধান দিলে কে ?'

নগেন বলিল—'আমিই দিয়েছি। আমার বন্ধুদের মহলে ওঁর খুব খ্যাতি। আপনারাও দেখলে মোহিত হয়ে যাবেন।'

হনুমানের স্বপ্ন ইত্যাদি গল্প

পরদিন খল্বিদং স্বামীর শুভাগমন হইল, সঙ্গে কেবল একটি কমণ্ডলু আর একটি বড় স্যুটকেস। নগেন মিথ্যা বলে নাই, টকটকে গৌরবর্ণ, চাঁচর ঝাঁকড়া চুল, মধুর কণ্ঠস্বর, চোখে একটা অপূর্ব প্রতিভান্বিত ঢুলুঢুলু ভাব। ছ-শ শিষ্য হওয়া কিছুই বিচিত্র নয়।

মানিনী দেবী প্রত্যহ শুদ্ধাচারে ভাবী গুরুদেবের সেবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। স্বামীজীর নিত্যকর্মপদ্ধতি একেবারে ধরাবাঁধা। সকালবেলা অনুপানসহ তিন পাথরবাটি চা, দ্বিপ্রহরে পবিত্র অন্নব্যঞ্জন, তাহার পর ঘণ্টা তিন-চার যোগনিদ্রা, বিকালে নানাপ্রকার ফলমূল মিষ্টান্ন, পুনর্বার চা, সন্ধ্যায় মধুরকণ্ঠে ধর্মব্যাখ্যা, সংগীত ও ঘুঙুর পরিয়া ভাবনৃত্য, রাত্রে সাত্ত্বিক লুচি পোলাও কালিয়া।

মানিনীর অন্তরে একটা সাড়া পড়িয়াছে। নভেল পড়া, লেস বোনা, ছাঁটা পশমের আসন তৈয়ারি প্রভৃতি সাংসারিক কার্যে আর তাঁহার মন নাই। প্রথম দিনেই তিনি নিজের হাতে স্বামীজীর উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করিলেন। দ্বিতীয় দিনে পাতে প্রসাদ পাইলেন। তৃতীয় দিনে বংশলোচন রোমাঞ্চিত হইয়া দেখিলেন খল্বিদং‌এর চর্বিত আকের ছিবড়া মানিনী পরম ভক্তি সহকারে চুষিতেছেন। বংশলোচন বার বার স্বামীজীর বাণী স্মরণ করিতে লাগিলেন —সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, এ সমস্তই ব্রহ্ম—কিন্তু মন প্রবোধ

মানিল না। ব্রহ্ম নিখিল চরাচরে থাকিতে পারেন, কিন্তু আকের ছিবড়ায় থাকিবেন কোন্ দুঃখে? একথা মনে করিতেই চিত্ত বিদ্রোহী হয়, পিত্ত চটিয়া ওঠে। ছি ছি বলিলে যথেষ্ট বলা হয় না, তোবা তোবা বলিতে ইচ্ছা করে।

চাটুজ্যে মহাশয় শুনিয়া বলিলেন 'তাইতো, বেশী বাড়াবাড়ি হচ্ছে। এই নগেনটাই যত নষ্টের গোড়া। দেশী ঠাকুরমশায় তোর দিদির মনে না ধরে তো একটা জটাধারী গাঁজাখোর আনলেই তো পারতিস।'

নগেন বলিল 'বা রে, আমি কেমন ক'রে জানব যে দিদির অত ভক্তি হবে?'

বংশলোচন কাতরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন 'এখন কি করা যায়?'

বিনোদ বলিলেন 'একটা ভৈরব-টৈরবী ধ'রে এনে তুমিও সাধনা শুরু কর, বিষে বিষক্ষয় হয়ে যাক। আর যদি সাহস থাকে তবে গিন্নীকে মনের কথা খুলে বল, খল্বিদংকে অর্ধচন্দ্রং দাও।'

নগেন বলিল 'তা হলে দিদি ভয়ংকর চটবে।'

কথাটা ভয়ংকর সত্য, পত্নীর ধর্মাচরণে বাধা দেওয়া সহজ কথা নয়। বংশলোচন আকুল চিন্তাসাগরে হাবুডুবু খাইতে লাগিলেন। এমন যে বিচক্ষণ চাটুজ্যে মহাশয় আর আর তীক্ষ্ণবুদ্ধি বিনোদ উকিল, ইঁহারাও প্রতিকারের কোনও

সুসাধ্য উপায় খুঁজিয়া পাইতেছেন না। হায় হায়, কে তাঁহাকে রক্ষা করিবে? ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া হাল ছাড়িয়া বসিয়া থাকা ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

মানিনী মনস্থির করিয়া ফেলিয়াছিলেন, খল্বিদংকেই গুরুত্বে বরণ করিবেন। কাল সকালে দীক্ষা। বাড়ির পূর্বদিকে সংলগ্ন যে মাঠটি আছে তাহাতে একটি বেদী রচনা করিয়া চারিদিকে ফুলের টব দিয়া সাজানো হইয়াছে। আজ বৈকালে খল্বিদং নিজে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সমস্ত আয়োজন তদারক করিতেছেন। বংশলোচন, চাটুজ্যে, বিনোদ ইত্যাদি পিছনে পিছনে আছেন. মানিনীও একটু তফাতে থাকিয়া সমস্ত দেখিতেছেন।

খল্বিদং গুন গুন করিয়া গান করিতে করিতে পায়চারি করিতেছেন এমন সময় তাঁহার নজরে পড়িল— মাঠের শেষ দিকে একটি বৃহদাকার ছাগল তাঁহাকে সতৃষ্ণ নয়নে নিরীক্ষণ করিতেছে। এই ছাগলটি লম্বকর্ণ নামে খ্যাত। সে যখন ছোট ছিল তখন বংশলোচন তাহাকে বেওয়ারিস অবস্থায় কুড়াইয়া পাইয়া বাড়িতে আনেন। সেই অবধি সে পরিবারভুক্ত হইয়া গিয়াছে এবং মানিনীর অত্যধিক আদর পাইয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে। এখন তাহার নবীন যৌবন। লম্বকর্ণ যদি মনুষ্য হইত তবে এ বয়সে তাহাকে

তরুণ বলা চলিত। কিন্তু সে অজন্মের অভিশাপ লইয়া জন্মিয়াছে, তাই লোকে তাহাকে বলে বোকাপাঁঠা।

খম্বিদং স্বামী লম্বকর্ণকে দেখিয়া প্রসন্নবদনে বলিলেন 'শ্রীভগবানের কি অপূর্ব সৃষ্টি এই জীবটি। বেঁচে থাকার যে আনন্দ, তা এতে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। প্রাণশক্তি যেন সর্বাঙ্গে উথলে উঠছে।'

স্বামীজী মাঠের নরম ঘাসে উপর বসিয়া পড়িলেন এবং এক মুঠা ঘাস ছিড়িয়া লইয়া ডাকিলেন—'আ—তু তু তু।'

লম্বকর্ণ আসিল না, স্বামীজীর দিকে চাহিয়া আস্তে আস্তে পিছু হটিতে লাগিল।

স্বামীজী সহাস্যে বলিলেন—'আহা, অবোধ জীব, কিঞ্চিৎ ভীত হয়েছে, আমাকে এখনও চেনে না কিনা। তোমরা ওকে তাড়া দিও না, জীবকে আকর্ষণ করবার উপায় হচ্ছে অসীম করুণা, অগাধ তিতিক্ষা। আ - তু তু তু তু।'

লম্বকর্ণ ভীত হইবার ছেলে নয়। আসল কথা, প্রথম দর্শনেই খম্বিদংএর উপর তাহার একটা অহৈতুকী অভক্তি জন্মিয়াছে। আজ তাঁহার মুখের মধুর হাসিটুকু দেখিয়া সেই অহৈতুকী অভক্তি অকস্মাৎ একটা বেয়াড়া বদখেয়ালে পরিণত হইল। লোকে যাহাই বলুক, লম্বকর্ণ মোটেই বোকা নয়। ছাগল হইলে কি হয়, তাহার একটা সহজাত বৈজ্ঞানিক প্রতিভা আছে। লম্বকর্ণ কলেজে পড়ে নাই, পাস করে



নক্ষত্রবেগে সম্মুখে ছুটিল

নাই, তথাপি তাহার জানা আছে যে বেগ আহরণ করিতে হইলে যথাসম্ভব দূর হইতে ধাবমান হওয়াই যুক্তিসংগত। আরও জানা আছে যে তাহার দেহের দেড় মন মাংসকে যদি তাহার বেগের অঙ্ক দিয়া গুণ করা হয় তবে যে বৈজ্ঞানিক রাশি উৎপন্ন হয় তাহার ধাক্কা সামলানো মানুষের অসাধ্য।

কিছুদুর পিছু হাঁটিয়া লম্বকর্ণ এক মুহূর্ত স্থির হইয়া



কার সাধ্য রোধে তার গতি

দাঁড়াইল। তাহার পর ঘাড় নীচু করিয়া শিং বাঁকাইয়া স্বামীজীর নধর উদর নিশানা করিয়া নক্ষত্রবেগে সম্মুখে ছুটিল।

স্বামীজীর মুখে প্রসন্ন হাসি তখনও লাগিয়া আছে, কিন্তু আর সকলে ব্যাপারটি বুঝিয়া লম্বকর্ণকে নিরস্ত করিবার জন্য ত্রস্ত চিৎকার করিয়া উঠিল। কিন্তু কার সাধ্য রোধে তার গতি। নিমেষের মধ্যে লম্বকর্ণের প্রচণ্ড গুঁতা ধাঁই করিয়া

লক্ষ্য স্থানে পৌঁছিল, খম্বিদং একবার মাত্র বাবা গো বলিয়া ডিগবাজি খাইয়া ধরাশায়ী হইলেন।

ডাক্তারবাবু বলিলেন— 'শুধু বোরিক কমপ্রেস। পেট ফুটো হয় নি, চোটও বেশী লাগে নি তবে শক-টা খুব খেয়েছেন। একটু পরেই উঠে বসতে পারবেন, তখন আবার ড্র-ড্রাম ব্রাণ্ডি। ব্যথাটা সারতে দিন-পনর লাগবে।'

ডাক্তার অত্যুক্তি করেন নাই। কিছুক্ষণ পরেই খম্বিদং চাঙ্গা হইয়া উঠিয়া বসিলেন। বলিলেন– 'ছাগলটা গেল কোথায়?'

বিনোদবাবু বলিলেন 'সেটাকে বেঁধে রাখা হয়েছে, আপনার কোনও ভয় নেই।'

স্বামীজী বলিলেন - 'ভয় আমি কোনও শালার করি না। কিন্তু ছাগলটাকে এক্ষুনি মেরে তাড়াতে হবে, ওটা মূর্তিমান পাপ।'

বিনোদবাবু বলিলেন - 'বলেন কি মশায়, আপনারা হলেন করুণার অবতার, পাপীকে যদি ক্ষমা না করেন তবে বেচারা দাঁড়ায় কোথা? আর লম্বকর্ণের স্বভাবটা তো হিংস্র নয়, আজ বোধ হয় হঠাৎ কিরকম ব্লাড-প্রেশার বেড়ে গিয়ে মাথা গরম হয়ে—কি বলেন ডাক্তারবাবু?'

উদয় বলিল—'বউ আজ ওকে একছড়া গাঁদাফুলের মালা খাইয়েছে, তাইতে বোধ হয়।'

খম্বিদং ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন 'ও-সব আমি শুনতে চাই না। এ বাড়িতে দুজনের স্থান নেই, হয় আমি নয় ঐ ব্যাটা।'

বংশলোচন দুরুদুরু বক্ষে পত্নীর দিকে চাহিয়া বলিলেন 'কি বল? ছাগলটাকে তা হ'লে বিদেয় করা যাক?'

মানিনী সবেগে ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন -'বাপরে, সে আমি পারব না।' এই কথা বলিয়াই তিনি সটান দোতলায় গিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বংশলোচনের এক জোড়া ছেঁড়া মোজা মেরামত করিতে লাগিয়া গেলেন।

খম্বিদং বলিলেন 'তা হ'লে আমিই বিদায় হই।'

চাটুজ্যে মহাশয় স্বামীজীর পিঠে হাত বুলাইয়া বলিলেন —'যা বলেছ দাদা। এই নির্বান্ধব পুরে দুশমনের হাতে কেন প্রাণটা খোয়াবে, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও, বেঁচে থাকলে অনেক শিষ্য জুটবে। এস, আমি একটা ট্যাক্সি ডেকে দিচ্ছি।'

বংশলোচন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া ভাবিতে লাগিলেন —স্ত্রীচরিত্র কি অদ্ভুত জিনিস।

১৩৩৭

মহেশের মহাযাত্রা

কেদার চাটুজ্যে মহাশয় বলিলেন—'আজকাল তোমরা সামান্য একটু বিদ্যে শিখে নাস্তিক হয়েছ, কিছুই মানতে চাও না। যখন আরও একটু শিখবে তখন বুঝবে যে আত্মা আছেন। ভূত, পেতনী—এঁরাও আছেন। বেম্মদত্যি, কন্ধকাটা—এঁয়ারাও আছেন।'

বংশলোচনবাবুর বৈঠকখানায় গল্প চলিতেছিল। তাঁহার শালা নগেন বলিল,—'আচ্ছা বিনোদ-দা, আপনি ভূত বিশ্বাস করেন ?'

বিনোদবাবু বলিলেন—'যখন প্রত্যক্ষ দেখব তখন বিশ্বাস করব। তার আগে হাঁ-না কিছুই বলতে পারি না।'

চাটুজ্যে বলিলেন- 'এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি ওকালতি কর! বলি, তোমার প্রপিতামহকে প্রত্যক্ষ করেছ ? ম্যাক-ডোনাল্ড, চার্চিল আর বাল্‌ডুইনকে দেখেছ ? তবে তাদের কথা নিয়ে অত মাতামাতি কর কেন ?'

'আচ্ছা আচ্ছা, হার মানছি চাটুজ্যে মশায়।'

'আপ্তবাক্য মানতে হয়। আরে, প্রত্যক্ষ করা কি যার তার কম্ম ? শ্রীভগবান কখনও কখনও তাঁর ভক্তদের

বলেন—দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ।' সেই দিব্যদৃষ্টি পেলে তবে সব দেখতে পাওয়া যায়।'

নগেন জিজ্ঞাসা করিল—'আপনি দেখতে পেয়েছেন চাটুজ্যে মশায়?'

'জ্যাঠামি করিস নি। এই কলকাতা শহরে রাস্তায় যারা চলাফেরা করে—কেউ কেরানী, কেউ দোকানী, কেউ মজুর, কেউ আর কিছু—তোমরা ভাব সবাই বুঝি মানুষ। তা মোটেই নয়। তাদের ভেতর সর্বদাই দু-দশটা ভূত পাওয়া যায়। তবে চিনতে পারা দুষ্কর। এই রকম ভূতের পাল্লায় পড়েছিলেন মহেশ মিত্তির।'

'কে তিনি?'

'জান না? আমাদের মজিলপুরের চরণ ঘোষের মামার শালা। এককালে তিনি কিছুই মানতেন না, কিন্তু শেষ দশায় তাঁকেও স্বীকার করতে হয়েছিল।'

সকলে একবাক্যে বলিলেন—'কি হয়েছিল বলুন না চাটুজ্যে মশায়!'

চাটুজ্যে মহাশয় হুঁকাটি হাতে তুলিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন।

ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর আগেকার কথা। মহেশ মিত্তির তখন শ্যামবাজারের শিবচন্দ্র কলেজে প্রফেসরি করতেন। অঙ্কের প্রফেসর, অসাধারণ বিদ্যে, কিন্তু প্রচণ্ড নাস্তিক। ভগবান আত্মা পরলোক কিছুই মানতেন না। এমন কি, স্ত্রী মারা গেলে আর বিবাহ পর্যন্ত করেন নি। খাদ্যাখাদ্যের বিচার ছিল না, বলতেন -শুয়োর না খেলে হিঁদুর উন্নতির আশা নেই, ওটা বাদ দিয়ে কোনও জাত বড় হ'তে পারে নি। মহেশের চালচলনের জন্য আত্মীয়-স্বজন তাঁকে একঘরে করেছিল। কিন্তু যতই অনাচার করুন তাঁর স্বভাবটা ছিল অকপট, পারতপক্ষে মিথ্যা কথা কইতেন না। তাঁর পরম বন্ধু ছিলেন হরিনাথ কুণ্ডু, তিনিও ঐ কলেজের প্রফেসর, ফিলসফি পড়াতেন। কিন্তু বন্ধু হ'লে কি হয়, দুজনে হরদম ঝগড়া হ'ত, কারণ হরিনাথ আর কিছু মানুন না মানুন ভূত মানতেন। তা ছাড়া মহেশবাবু অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, কেউ তাঁকে হাসতে দেখে নি, আর হরিনাথ ছিলেন আমুদে লোক, কথায় কথায় ঠাট্টা ক'রে বন্ধুকে উদ্‌ব্যস্ত করতেন। তবু মোটের ওপর তাঁদের পরস্পরের প্রতি খুব একটা টান ছিল।

তখন রাজনীতি চর্চার এত রেওয়াজ ছিল না, আর ভদ্রলোকের ছেলের অন্নচিন্তাও এমন চমৎকারা হয় নি, দু-একটা পাস করতে পারলে যেমন-তেমন চাকরি জুটে যেত।

লোকের তাই উঁচুদরের বিষয় আলোচনা করবার সময় ছিল। ছোকরারা চিন্তা ক'রত -বউ ভালবাসে কি বাসে না। যাদের সে সন্দেহ মিটে গেছে, তারা মাথা ঘামাত—ভগবান আছেন কি নেই। একদিন কলেজে কাজ ছিল না, অধ্যাপকেরা সকলে মিলে গল্প করছিলেন। গল্পের আরম্ভ যা নিয়েই হ'ক, মহেশ আর হরিনাথ কথাটা টেনে নিয়ে ভূতে আর ভগবানে হাজির করতেন, কারণ এই নিয়ে তর্ক করাই তাঁদের অভ্যাস। এদিনও তাই হয়েছিল।

অলোচনা শুরু হয় ঝি-চাকরের মাইনে নিয়ে। কলেজের পণ্ডিত দীনবন্ধু বাচস্পতি মশায় দুঃখ করছিলেন-- 'ছোটলোকের লোভ এত বেড়ে গেছে যে আর পেরে ওঠা যায় না।' মহেশবাবু বলেলন- 'লোভ সকলেরই বেড়েছে, আর বাড়াই উচিত, নইলে মনুষ্যত্বের বিকাশ হবে কিসে।' পণ্ডিতমশায় উত্তর দিলেন--'লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।' মহেশবাবু পাল্টা জবাব দিলেন 'লোভ ত্যাগ করলেও মৃত্যুকে ঠেকানো যায় না।'

তর্কটা তেমন জুতসই হচ্ছে না দেখে হরিনাথবাবু একটু উসকে দেবার জন্য বললেন—'আমাদের মতন লোকের লোভ হওয়া উচিত মৃত্যুর পর। মাইনে তো পাই মোটে পৌনে দু-শ, তাতে ইহকালের কটা শখই বা মিটবে

তাইতো পরকালের আশায় ব'সে আছি, আত্মাটা যদি স্বর্গে গিয়ে একটু ফুর্তি করতে পারে।'

দীনবন্ধু পণ্ডিত বললেন —'কে বললে তুমি স্বর্গে যাবে? আর স্বর্গের তুমি জানই বা কি?'

'সমস্তই জানি পণ্ডিত মশায়। খাসা জায়গা, না গরম না ঠাণ্ডা। মন্দাকিনী কুলুকুলু বইছে, তার ধারে ধারে পারিজাতের ঝোপ। সবুজ মাঠের মধ্যিখানে কল্পতরু গাছে আঙুর বেদানা আম রসগোল্লা কাটলেট সব রকম ফ'লে আছে, ছেঁড় আর খাও। জন-কতক ছোকরা-দেবদূত গোলাপী উড়ুনি গায়ে দিয়ে সুধার বোতল সাজিয়ে ব'সে রয়েছে, চাইলেই ফটাফট খুলে দেবে। ওই হোথা কুঞ্জবনে ঝাঁকে ঝাঁকে অপ্সরা ঘুরে বেড়াচ্ছে, দুদণ্ড রসালাপ কর, কেউ কিছু বলবে না। যত খুশি নাচ দেখ, গান শোন। আর কালোয়াতি চাও তো নারদ মুনির আস্তানায় যাও।'

মহেশবাবু বলিলেন—'সমস্ত গাঁজা। পরলোক আত্মা ভূত ভগবান কিছুই নেই। ক্ষমতা থাকে প্রমাণ কর।'

তর্ক জ'মে উঠল। প্রফেসররা কেউ এক পক্ষে কেউ অপর পক্ষে দাঁড়ালেন। পণ্ডিত মশায় দারুণ অবজ্ঞায় ঠোঁট উলটে ব'সে রইলেন। বৃদ্ধ প্রিনসিপাল যত্ন সাণ্ডেল রফা ক'রে বললেন— 'ভূতের তেমন দরকার দেখি না, কিন্তু আত্মা আর ভগবান বাদ দিলে চলে না।' মহেশ মিত্তির বললেন—

'কেউ-উ নেই, আমি দশ মিনিটের মধ্যে প্রমাণ ক'রে দিচ্ছি।' হরিনাথ কুণ্ডু মহা উৎসাহে বন্ধুর পিঠ চাপড়ে বললেন—'লেগে যাও।'

তারপর মহেশবাবু ফুলস্কাপ কাগজ আর পেনসিল নিয়ে একটি বিরাট অঙ্ক কষতে লেগে গেলেন। ঈশ্বর আত্মা আর ভূত—এই তিন রাশি নিয়ে অতি জটিল অঙ্ক, তার গতি বোঝে কার সাধ্য। বিস্তর যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ ক'রে হাতির শুঁড়ের মতন বড় বড় চিহ্ন টেনে অবশেষে সমাধান করলেন ঈশ্বর = ০, আত্মা = ভূত = । ০।

বাচস্পতি বললেন—'বদ্ধ উন্মাদ।'

মহেশবাবু বললেন—'উন্মাদ বললেই হয় না। এ হ'ল গিয়ে দস্তুরমত ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলস। সাধ্য থাকে তো আমার অঙ্কের ভুল বার করুন।'

হরিনাথ বললেন—'অঙ্ক-টঙ্ক আমার আসে না। বাচস্পতি মশায় যদি ভগবান দেখাবার ভার নেন তো আমি মহেশকে ভূত দেখাতে পারি।'

বাচস্পতি বললেন—'আমার ব'য়ে গেছে।'

মহেশবাবু বললেন—'বেশ তো হরিনাথ তুমি ভূতই দেখাও না। একটার প্রমাণ পেলে আর সমস্তই মেনে নিতে রাজী আছি।'

হরিনাথবাবু বললেন—'এই কথা? আচ্ছা আসছে

হপ্তায় শিবচতুর্দশী পড়ছে। সেদিন তুমি আমার সঙ্গে রাত বারটায় মানিকতলায় নতুন খালের ধারে চল, পষ্টাপষ্টি ভূত দেখিয়ে দেব। কিন্তু যদি কোনও বিপদ ঘটে তো আমাকে দুষতে পারবে না।'

'যদি দেখাতে না পার?'

'আমার নাক কেটে দিও। আর যদি দেখাতে পারি তো তোমার নাক কাটব।'

প্রিন্সিপাল যদু সাণ্ডেল বললেন — 'কাটাকাটির দরকার কি, সত্যের নির্ণয় হ'লেই হ'ল।'

শিবচতুর্দশীর রাত্রে মহেশ মিত্তির আর হরিনাথ কুণ্ডু মানিকতলায় গেলেন। জায়গাটা তখন বড়ই ভীষণ ছিল, রাস্তায় আলো নেই, দুধারে বাবলা গাছে আরও অন্ধকার করেছে। সমস্ত নিস্তব্ধ, কেবল মাঝে মাঝে প্যাঁচার ডাক শোনা যাচ্ছে। হোঁচট খেতে খেতে দুজনে নতুন খালের ধারে পৌঁছলেন। বছর-দুই আগে ওখানে প্লেগের হাসপাতাল ছিল, এখনও তার গোটাকতক খুঁটি দাঁড়িয়ে আছে।

মহেশ মিত্তির অবিশ্বাসী সাহসী লোক, কিন্তু তাঁরও গা ছমছম করতে লাগল। হরিনাথ সারা রাস্তা কেবল ভূতের কথাই কয়েছেন -তারা দেখতে কেমন, মেজাজ

কেমন, কি খায়, কি পরে। দেবতারা হচ্ছেন উদারপ্রকৃতি দিলদরিয়া, কেউ তাঁদের না মানলেও বড়-একটা কেয়ার করেন না। কিন্তু অপদেবতারা পদবীতে খাটো ব'লে তাঁদের আত্মসম্মানবোধ বড়ই উগ্র, না মানলে ঘাড় ধ'রে তাঁদের প্রাপ্য মর্যাদা আদায় করেন। এই সব কথা।

হঠাৎ একটা বিকট আওয়াজ শোনা গেল, যেন কোনও অশরীরী বেরাল তার পলাতকা প্রণয়িনীকে আকুল আহ্বান করছে। একটু পরেই মহেশবাবু রোমাঞ্চিত হয়ে দেখলেন, একটা লম্বা রোগা কুচকুচে কাল মূর্তি দু-হাত তুলে সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তাব পিছনে একটু দূরে ঐ রকম আরও দুটো।

হরিনাথবাবু থরথর ক'রে কাঁপতে কাঁপতে বললেন—'রাম রাম সীতারাম! ও মহেশ, দেখছ কি, তুমিও বল না!'

আর একটু হ'লেই মহেশবাবু রামনাম উচ্চারণ ক'রে ফেলতেন, কিন্তু তাঁর কনশেন্স্ বাধা দিয়ে বললে—'উঁহু, একটু সবুর কর, যদি ঘাড় মটকাবার লক্ষণ দেখ তখন না-হয় রামনাম করা যাবে।'

এঁরা একটা পাকুড় গাছের নীচে ছিলেন। হঠাৎ ওপর থেকে খানিকটা কাদা-গোলা জল মহেশের মাথায় এসে পড়ল।

তখন সামনের সেই কাল মূর্তিটা নাকী সুরে বললে—'মহেশবাবু, আপনি নাকি ভূত মানেন না?'

এ অবস্থায় বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই ব'লে থাকেন—আজ্ঞে হাঁ, মানি বই কি। কিন্তু মহেশ মিত্তির বেয়াড়া লোক, হঠাৎ তাঁর কেমন একটা খেয়াল হ'ল, ধাঁ ক'রে এগিয়ে গিয়ে ভূতের কাঁধ খামচে ধ'রে জিজ্ঞাসা করলেন 'কোন্ ক্লাস?'

ভূত থতমত খেয়ে জবাব দিলে 'সেকেণ্ড ইয়ার সার!'

'রোল নম্বর কত?'

ভূত করুণ নয়নে হরিনাথের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে- 'বলি সার?'

হরিনাথের মুখে রাম রাম ভিন্ন কথা নেই। পিছনের দুটো ভূত অদৃশ্য হয়ে গেল। পাকুড় গাছে যে ছিল সে টুপ ক'রে নেমে এসে পালিয়ে গেল। তখন বেগতিক দেখে সামনের ভূতটি ঝাঁকুনি দিয়ে মহেশের হাত ছাড়িয়ে চোঁচা দৌড় মারলে।

মহেশ মিত্তির হরিনাথের পিঠে একটা প্রচণ্ড কিল মেরে বললেন—'জোচ্চোর!'

হরিনাথও পাল্টা কিল মেরে বললেন—'আহাম্মক!'

নিজের নিজের পিঠে হাত বুলতে বুলতে দুই বন্ধু বাড়ি-মুখো হলেন। আসল ভূত যারা আশেপাশে লুকিয়ে

ছিল তারা মনে মনে বললে -আজি রজনীতে হয় নি সময়।

পরদিন কলেজে হুলস্থূল বেধে গেল। সমস্ত ব্যাপার শুনে প্রিনসিপাল ভয়ংকর রাগ ক'রে বললেন--'অত্যন্ত শেমফুল কাণ্ড। দুজন নামজাদা অধ্যাপক একটা তুচ্ছ বিষয় নিয়ে হাতাহাতি! হরিনাথ তোমার লজ্জা নেই?'

হরিনাথবাবু ঘাড় চুলকে বললেন 'আজ্ঞে আমার উদ্দেশ্যটা ভালই ছিল। মহেশকে রিফর্ম করবার জন্য যদি একটু ইয়ে ক'রেই থাকি তাতে দোষটা কি- হাজার হোক আমাব বন্ধু তো?'

মহেশবাবু গর্জন ক'রে বললেন 'কে তোমার বন্ধু?'

প্রিনসিপাল বললেন 'মহেশ তুমি চুপ কর। উদ্দেশ্য যাই হ'ক, কলেজের ছেলেদের এর ভেতর জড়ানো একেবারে অমার্জনীয় অপরাধ। হরিনাথ তুমি বাড়ি যাও, তোমায় সাসপেণ্ড করলুম। আর মহেশ তোমাকেও সাবধান ক'রে দিচ্ছি—আমার কলেজে ভুতুড়ে তর্ক তুলতে পারবে না।'

মহেশবাবু উত্তর দিলেন —'সে প্রতিশ্রুতি দেওয়া শক্ত। সকল রকম কুসংস্কার দূর করাই আমার জীবনের ব্রত।'

'তবে তোমাকেও সাসপেণ্ড করলুম।'

অন্যান্য অধ্যাপকরা চুপ ক'রে সমস্ত শুনছিলেন। তাঁরা প্রিনসিপালের হুকুম শুনে কোনও প্রতিবাদ করলেন না, কারণ সকলেই জানতেন যে তাঁদের কর্তার রাগ বেশী দিন থাকে না।

মহেশবাবু তাঁর বাসায় ফিরে এলেন। হরিনাথের ওপর প্রচণ্ড রাগ—হতভাগা একটা গভীর তত্ত্বের মীমাংসা করতে চায় জুয়োচুরির দ্বারা! সে আবার ফিলসফি পড়ায়! এমন অপ্রত্যাশিত আঘাত মহেশবাবু কখনও পান নি।

মানুষের মন যখন নিদারুণ ধাক্কা খায় তখন সে তার ভাব ব্যক্ত করবার জন্য উপায় খোঁজে। কেউ কাঁদে, কেউ তর্জন-গর্জন করে, কেউ কবিতা লেখে। একটা তুচ্ছ কোঁচ-বকের হত্যাকাণ্ড দেখে মহর্ষি বাল্মীকির মনে যে ঘা লেগেছিল তাই প্রকাশ করবার জন্য তিনি হঠাৎ দু-ছত্র শ্লোক রচনা ক'রে ফেলেন -মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বম্ ইত্যাদি। তার পর সাতকাণ্ড রামায়ণ লিখে তাঁর ভাবের বোঝা নামাতে পেরেছিলেন। আমাদের মহেশ মিত্তির চিরকাল নীরস অঙ্কশাস্ত্রের চর্চা ক'রে এসেছেন, কাব্যের কিছুই জানতেন না। কিন্তু আজ তাঁরও মনে সহসা একটা কবিতার অঙ্কুর গজগজ করতে লাগল। তিনি আর বেগ সামলাতে পারলেন

না, কলেজের পোশাক না ছেড়েই বড় একখানা আলজেব্রা খুলে তার প্রথম পাতায় লিখলেন

হরিনাথ কুণ্ডু,
খাই তার মুণ্ডু।

কবিতাটি লিখে বার বার ডাইনে বাঁয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে দেখে আদিকবি বাল্মীকির মতন ভাবলেন, হাঁ, উত্তম হয়েছে।

কিন্তু একটা খটকা বাধল। কুণ্ডুর সঙ্গে মুণ্ডুর মিল আবহমান কাল থেকে চ'লে আসছে, এতে মহেশের কৃতিত্ব কোথায়? কালিদাসই হ'ন আর রবীন্দ্রনাথই হ'ন, কুণ্ডুর সঙ্গে মুণ্ডু মেলাতেই হবে -এ হ'ল প্রকৃতির অলঙ্ঘনীয় নিয়ম। মহেশ একটু ভেবে ফের লিখলেন

কুণ্ডু হরিনাথ,
মুণ্ডু করি পাত।

হাঁ, এইবার মৌলিক রচনা বলা যেতে পারে। মহেশের মনটা একটু শান্ত হ'ল। কিন্তু কাব্যসরস্বতী যদি একবার কাঁধে ভর করেন তবে সহজে নামতে চান না। মহেশবাবু লিখতে লাগলেন—

হরিনাথ ওরে,
হবি তুই ম'রে
নরকের পোকা
অতিশয় বোকা।

উঁহু, নরকই নেই তার আবার পোকা। মহেশবাবু স্থির করলেন কাব্যে কুসংস্কার নাম দিয়ে তিনি শীঘ্রই একটা প্রবন্ধ রচনা করবেন, তাতে মাইকেল রবীন্দ্রনাথ কাকেও রেহাই দেবেন না। তার পর তাঁর কবিতার শেষের চার লাইন কেটে নিয়ে ফের লিখলেন—

ওরে হরিনাথ,
তোরে করি কাত,
পিঠে মারি চড়—

এমন সময় মহেশের চাকরটা এসে বললে 'বাবু চা হবে কি দিয়ে? দুধ তো ছিঁড়ে গেছে।'

মহেশবাবু অন্যমনস্ক হয়ে বললেন 'সেলাই ক'রে নে।'

পিঠে মারি চড়,
মুখে গুঁজি খড়।
জ্বেলে দেশলাই
আগুন লাগাই।

কিন্তু আবার এক আপত্তি। হরিনাথকে পুড়িয়ে ফেললে জগতের কোন লাভ হবে না, অনর্থক খানিকটা জান্তব পদার্থ বরবাদ হবে। বরং তার চাইতে

হরিনাথ ওরে
পোড়াব না তোরে।
নিয়ে যাব ধাপা

দেব মাটি চাপা।
সার হয়ে যাবি,
ট্যাঁড়স ফলাবি।

মহেশবাবু আরও অনেক লাইন রচনা করেছিলেন, তা আমার মনে নেই। কবিতা লিখে খানিকটা উচ্ছ্বাস বেরিয়ে যাওয়ায় তাঁর হৃদয়টা বেশ হালকা হ'ল, তিনি কাপড়-চোপড় ছেড়ে ইজিচেয়ারে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন।

তিন দিন যেতে না যেতে প্রিনসিপাল মহেশ আর হরিনাথকে ডেকে পাঠালেন। তাঁরা আবার নিজের নিজের কাজে বাহাল হলেন, কিন্তু তাঁদের বন্ধুত্ব ভেঙে গেল। সহকর্মীরা মিলনের অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু কোনও ফল হ'ল না। হরিনাথ বরং একটু সন্ধির আগ্রহ দেখিয়েছিলেন, কিন্তু মহেশ একেবারে পাথরের মতন শক্ত হয়ে রইলেন।

কিছুদিন পরে মহেশবাবুর খেয়াল হ'ল— প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে একতরফা বিচার করাটা ন্যায়সংগত নয়, এর অনুকূল প্রমাণ কে কি দিয়েছেন তাও জানা উচিত। তিনি দেশী বিলিতী বিস্তর বই সংগ্রহ ক'রে পড়তে লাগলেন, কিন্তু তাতে তাঁর অবিশ্বাস আরও প্রবল হ'ল। প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিছুই নেই, কেবল আছে—অমুক ব্যক্তি কি বলছেন আর

কি দেখেছেন। বাঘের অস্তিত্বে মহেশের সন্দেহ নেই, কারণ জন্তুর বাগানে গেলেই দেখা যায়। ভূত যদি থাকেই তবে খাঁচায় পুরে দেখা না বাপু। তা নয়, শুধু ধাপ্পাবাজি। প্রেততত্ত্ব চর্চা ক'রে মহেশবাবু বেজায় চ'টে উঠলেন। শেষটায় এমন হ'ল যে ভূতের গুষ্ঠিকে গালাগাল না দিয়ে তিনি জলগ্রহণ করতেন না।

প'ড়ে প'ড়ে মহেশের মাথা গরম হয়ে উঠল। রাত্রে ঘুম হয় না, কেবল স্বপ্ন দেখেন ভূতে তাঁকে ভেংচাচ্ছে। এমন স্বপ্ন দেখেন ব'লে নিজের উপরও তাঁর রাগ হ'তে লাগল। ডাক্তার বললে -পড়াশুনা বন্ধ করুন, বিশেষ ক'রে ঐ ভূতুড়ে বইগুলো যা মানেন না তার চর্চা করেন কেন। কিন্তু ঐ সব বই পড়া মহেশের এখন একটা নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পড়লেই রাগ হয়, আর সেই রাগেতেই তাঁর সুখ।

অবশেষে মহেশ মিত্তির কঠিন রোগে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। দিন দিন শরীর ক্ষয়ে যেতে লাগল, কিন্তু রোগটা ঠিক নির্ণয় হ'ল না। সহকর্মীরা প্রায়ই এসে তাঁর খবর নিতেন। হরিনাথও একদিন এসেছিলেন, কিন্তু মহেশ তাঁর মুখদর্শন করলেন না।

সাত-আট মাস কেটে গেল। শীতকাল, রাত দশটা। হরিনাথবাবু শোবার উদ্‌যোগ করছেন এমন সময় মহেশের চাকর এসে খবর দিলে যে তার বাবু ডেকে পাঠিয়েছেন, অবস্থা বড় খারাপ। হরিনাথ তখনই হাতি-বাগানে মহেশের বাসায় ছুটলেন।

মহেশের আর দেরি নাই, মৃত্যুর ভয়ও নেই। বললেন 'হরিনাথ তোমায় ক্ষমা করলুম। কিন্তু ভেবো না যে আমার মত কিছুমাত্র বদলেছে। এই রইল আমার উইল, তোমাকে অছি নিযুক্ত করেছি। আমার পৈতৃক দশ হাজার টাকার কাগজ ইউনিভার্সিটিকে দান করেছি, তার সুদ থেকে প্রতি বৎসর একটা পুরস্কার দেওয়া হবে। যে ছাত্র ভূতের অনস্তিত্ব সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ লিখবে সে ঐ পুরস্কার পাবে। আর দেখ—খবরদার, শ্রাদ্ধ-ট্রাদ্ধ ক'রো না। ফুলের মালা, চন্দন-কাঠ ঘি এসব দিও না, একদম বাজে খরচ। তবে হাঁ, দু-চার বোতল কেরোসিন ঢালতে পার। দেড় সের গন্ধক আর পাঁচ সের শোরা আনানো আছে, তাও দিতে পার, চটপট কাজ শেষ হয়ে যাবে। আচ্ছা, চললুম তা হ'লে।'

রাত প্রায় সাড়ে এগারটা। মহেশের আত্মীয়স্বজন কেউ কলকাতায় নেই, থাকলেও বোধ হয় তারা আসত না। বড়দিনের বন্ধ, কলেজের সহকর্মীরা প্রায় সকলেই অন্যত্র

গেছেন। হরিনাথ মহা বিপদে পড়লেন। মহেশবাবুর চাকরকে বললেন পাড়ার জনকতক লোক ডেকে আনতে।

অনেকক্ষণ পরে দুজন মাতব্বর প্রতিবেশী এলেন। ঘরে ঢুকলেন না, দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন—'চুপ ক'রে ব'সে আছেন যে বড়? সংকারের ব্যবস্থা কি করলেন?'

হরিনাথ বললেন 'আমি একলা মানুষ, আপনাদের ওপরেই ভরসা।'

'ওই বেলেল্লা হতভাগার লাশ আমরা বইব? ইয়ার্কি পেয়েছেন নাকি!' এই কথা ব'লেই তাঁরা স'রে পড়লেন।

হরিনাথের তখন মনে পড়ল, বড় রাস্তার মোড়ে একটা মাটকোঠায় সাইনবোর্ড দেখেছেন—বৈতরণী সমিতি, ভদ্র-মহোদয়গণের দিবারাত্র সস্তায় সংকার। চাকরকে বসিয়ে রেখে তখনই সেই সমিতির খোঁজে গেলেন।

অনেক চেষ্টায় সমিতি থেকে তিন জন লোক যোগাড় হ'ল। পনর টাকা পারিশ্রমিক, আর শীতের ওষুধ বাবদ ন-সিকে। সমস্ত আয়োজন শেষ হ'লে হরিনাথ আর তাঁর তিন সঙ্গী খাট কাঁধে নিয়ে রাত আড়াইটার সময় নিমতলায় রওনা হলেন।

অমাবস্যার রাত্রি, তার ওপর আবার কুয়াশা। হরিনাথের দল কর্নওয়ালিস স্ট্রীট দিয়ে চললেন। গ্যাসের আলো মিটমিট করছে, পথে জনমানব নেই। কাঁধের বোঝা ক্রমেই ভারী বোধ হ'তে লাগল, হরিনাথ হাঁপিয়ে পড়লেন। বৈতরণী সমিতির সর্দার ত্রিলোচন পাকড়াশী বুঝিয়ে দিলেন এমন হয়েই থাকে, মানুষ ম'রে গেলে তার ওপর জননী বসুন্ধরার টান বাড়ে।

হরিনাথ একলা নয়, তাঁর সঙ্গীরা সকলেই সেই শীতে গলদঘর্ম হয়ে উঠল। খাট নামিয়ে খানিক জিরিয়ে আবার যাত্রা।

কিন্তু মহেশ মিত্তিরের ভার ক্রমশই বাড়ছে, পা আর এগয় না। পাকড়াশী বললেন 'ঢের ঢের বয়েছি মশায়, এমন জগদ্দল মড়া কখনও কাঁধে করি নি। দেহটা তো শুকনো, লোহা খেতেন বুঝি? পনের টাকায় হবে না মশায়, আরও পাঁচ টাকা চাই।'

হরিনাথ তাতেই রাজী, কিন্তু সকলে এমন কাবু হয়ে পড়েছে যে দু-পা গিয়ে আবার খাট নামাতে হ'ল। হরিনাথ ফুটপাথে এলিয়ে পড়লেন, বৈতরণীর তিন জন হাঁপাতে হাঁপাতে তামাক টানতে লাগল।

ওঠবার উপক্রম করছেন এমন সময় হরিনাথের নজর পড়ল— কুয়াশার ভিতর দিয়ে একটা আবছায়া তাঁদের দিকে

এগিয়ে আসছে। কাছে এলে দেখলেন—কাল র‍্যাপার মুড়ি দেওয়া একটা লোক। লোকটি বললে 'এঃ আপনারা হাঁপিয়ে পড়েছেন দেখছি। বলেন তো আমি কাঁধ দিই।'

হরিনাথ ভদ্রতার খাতিরে দু-একবার আপত্তি জানালেন, কিন্তু শেষটায় রাজী হলেন। লোকটি কোন জাত তা আর জিজ্ঞাসা করলেন না, কারণ মহেশ মিত্তির ও-বিষয়ে চিরকাল সমদর্শী, এখন তো কথাই নেই। তা ছাড়া যে লোক উপযাচক হয়ে শ্মশানযাত্রার সঙ্গী হয় সে তো বান্ধব বটেই।

ত্রিলোচন পাকড়াশী বললেন—'কাঁধ দিতে চাও দাও, কিন্তু বখরা পাবে না, তা ব'লে রাখছি।'

আগন্তুক বললে– 'বখরা চাই না।'

এবার হরিনাথকে কাঁধ দিতে হ'ল না, তাঁর জায়গায় নতুন লোকটি দাঁড়াল। আগের চেয়ে যাত্রাটা একটু দ্রুত হ'ল, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আর পা চলে না, ফের খাট নামিয়ে বিশ্রাম।

পাকড়াশী বললেন- 'কুড়ি টাকার কাজ নয় বাবু, এ হ'ল মোষের গাড়ির বোঝা। আরও পাঁচ টাকা চাই।'

এমন সময় আবার একজন পথিক এসে উপস্থিত

ঠিক প্রথম লোকটির মতন কাল র‍্যাপার গায়ে। এও খাট বইতে প্রস্তুত। হরিনাথ দ্বিরুক্তি না ক'রে তার সাহায্য নিলেন। এবার পাকড়াশী মশায় রেহাই পেলেন।

খাট চলেছে, আর একটু জোরে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আবার ক্লান্তি। মহেশের ভার অসহ্য হয়ে উঠেছে, তার দেহে কিছু ঢোকে নি তো? খাট নামিয়ে আবার সবাই দম নিতে লাগল।

কে বলে শহুরে লোক স্বার্থপর? আবার একজন সহায় এসে হাজির, সেই কাল র‍্যাপার গায়ে। হরিনাথের ভাববার অবসর নেই, বললেন, চল, চল।

আবার যাত্রা, আরও একটু জোরে, তার পর ফের খাট নামাতে হ'ল। এই যে, চতুর্থ বাহক এসে হাজির, সেই কাল র‍্যাপার। এরা কি মহেশকে বইবার জন্যই এই তিন পহর রাতে পথে বেরিয়েছে? হরিনাথের আশ্চর্য হবার শক্তি নেই, বললেন – 'ওঠাও খাট, চল জলদি।'

চারজন অচেনা বাহকের কাঁধে মহেশের খাট চলেছে, পিছনে হরিনাথ আর বৈতরণী সমিতির তিন জন। এইবার গতি বাড়ছে, খাট হনহন ক'রে চলছে। হরিনাথ আর তাঁর সঙ্গীদের ছুটতে হ'ল।

আরে অত তাড়াতাড়ি কেন, একটু আস্তে চল। কেই বা কথা শোনে! ছুট ছুট। 'আরে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ,

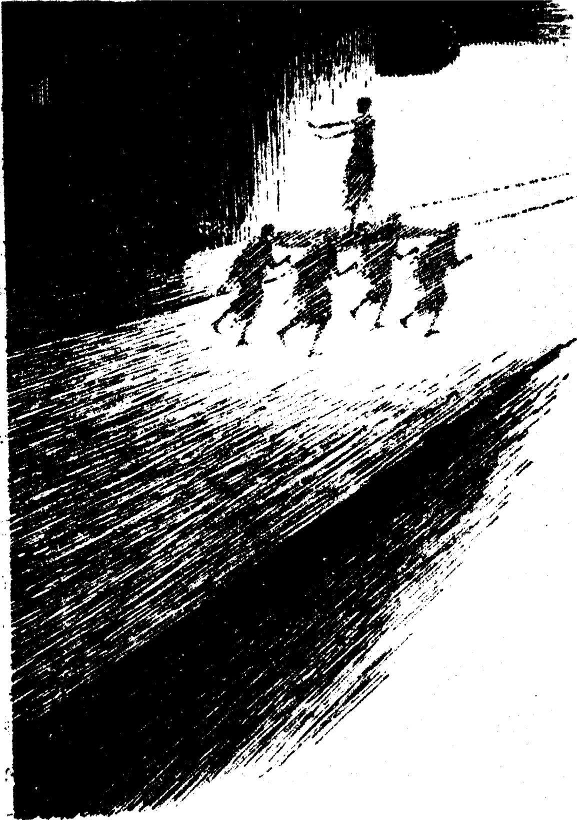
থাম থাম, বীডন স্ট্রীট ছাড়িয়ে গেলে যে। লোকগুলো



কি, কি? এই যে আমি

কি শুনতে পায় না? ওহে পাকড়াশী, থামাও না ওদের।"

কোথায় পাকড়াশী? তিনি বিচক্ষণ লোক, ব্যাপারটা বুঝে টাকার মায়া ত্যাগ ক'রে সদলে পালিয়েছেন।



'আছে, আছে, সব আছে'

মহেশের খাট তখন তীর বেগে ছুটছে, হরিনাথ পাগলের

মতন পিছু পিছু দৌড়চ্ছেন। কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, গোল-দিঘি, বউবাজারের মোড়—সব পার হয়ে গেল। কুয়াশা ভেদ ক'রে সামনের সমস্ত পথ ফুটে উঠেছে—এ পথের কি শেষ নেই? রাস্তা কি ওপরে উঠেছে না নীচে নেমেছে? এ কি আলো না অন্ধকার? দূরে ও কি দেখা যাচ্ছে সমুদ্রের ঢেউ, না চোখের ভুল?

হরিনাথ ছুটতে ছুটতে নিরন্তর চিৎকার করছেন - 'থাম, থাম।' ও কি, খাটের ওপর উঠে বসেছে কে? মহেশ? মহেশই তো। কি ভয়ানক! দাঁড়িয়েছে, ছুটন্ত খাটের ওপর খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। পিছনে ফিরে লেক-চারের ভঙ্গীতে হাত নেড়ে কি বলছে?

দূর দূরান্তর থেকে মহেশের গলার আওয়াজ এল 'হরিনাথ—ও হরিনাথ—ওহে হরিনাথ—'

'কি, কি? এই যে আমি।'

'ও হরিনাথ--আছে, আছে, সব আছে, সব সত্যি

মহেশের খাট আগোচর হয়ে এল, তখনও তাঁর ক্ষীণ কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে—'আছে, আছে…'

হরিনাথ মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। পরদিন সকালে ওয়েলস্‌লি স্ট্রীটের পুলিস তাঁকে দেখতে পেয়ে মাতাল ব'লে চালান দিলে। তাঁর স্ত্রী খবর পেয়ে বহু কষ্টে তাঁকে উদ্ধার করেন।

বংশলোচনবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—'গয়ায় পিণ্ডি দেওয়া হয়েছিল কি?'

'শুধু গয়ায়! পিণ্ডিদাদনর্থাএ পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কোন ফল হয় নি, পিণ্ডি ছিটকে ফিরে এল।'

'তার মানে?'

'মানে—মহেশ পিণ্ডি নিলেন না, কিংবা তাঁকে নিতে দিলে না।'

'আশ্চর্য। মহেশ মিত্তিরের টাকাটা?'

'সেটা ইউনিভার্সিটিতে গচ্ছিত আছে। কিন্তু কাজ কিছুই হয় নি, ভূতের বিপক্ষে প্রবন্ধ লিখতে কোনও ছাত্রের সাহস নেই। এখন সেই টাকা সুদে-আসলে প্রায় পঁচিশ হাজার হয়েছে। একবার সেনেটে প্রস্তাব ওঠে টাকাটা প্রত্নবিভাগের জন্য খরচ হ'ক। কিন্তু ছাদের ওপর এমন দুপদাপ শব্দ শুরু হ'ল যে সব্বাই ভয়ে পালালেন। সেই থেকে মহেশফাণ্ডের নাম কেউ করে না।'

রাতারাতি

শহরে আবার ছেলেধরার উপদ্রব শুরু হইয়াছে। বিকালে বংশলোচনবাবুর বৈঠকখানায় তাহারই কথা হইতেছে। বংশলোচনের ভাগনে উদয় মহা উৎসাহে হাত নাড়িয়া বলিতেছে—'আজকের খবর শুনেছেন? পঞ্চাশটা ছেলে হারিয়েছে। কাল পঁচাত্তরটা। কিন্তু আশ্চর্য এই, যারা নিরুদ্দেশ হচ্ছে তাদের নামধাম কেউ টের পায় না। এদিকে লোকে খেপে উঠেছে, মোটর গাড়ি পোড়াচ্ছে, রাস্তার মানুষকে ধ'রে ধ'রে ঠেঙাচ্ছে, পুলিস কিছুই করিতে পারছে না। ওঃ, হুলস্থূল ব্যাপার!'

বংশলোচনবাবু বলিলেন—'কাগজে কি লিখেছে?'

তাঁহার শ্যালা নগেন বলিল 'এই শুনুন না, আজকের ধূমকেতু খুব জোর লিখেছে। ' আমরা জানিতে চাই দেশের এই অরাজক অবস্থার জন্য দায়ী কে। অজ্ঞ লোকে রটাইতেছে বালি ব্রিজের বনিয়াদ পোক্ত করিবার জন্য দশ হাজার ছেলে পুঁতিবে। বিজ্ঞ লোকে বলিতেছেন ছেলেরা সংসারে বীতরাগ হইয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিতেছে। কাহার কথা বিশ্বাস করিব? দেশনেতৃগণ এখন দলাদলি

বন্ধ রাখুন, গভর্নমেন্ট উঠিয়া পড়িয়া লাগুন, আমরা তারস্বরে প্রশ্ন করিতেছি তাহার উত্তর দিন কোন্ দুরাত্মা দেশ-মাতৃকাকে সন্তানহারা করিতেছে ?'

বংশলোচনের ছোট ছেলে ঘেণ্টু বলিল- 'বাবা, ছেলেধরা বাবা ধরে ? বল না বাবা ?'

উকিল বিনোদবাবু বলিলেন—'তেমন তেমন বাবা হ'লে ধরে বই কি। কিন্তু তুমি ভেবো না খোকা, আমরা রক্ষা করব।'

বৃদ্ধ কেদার চাটুজ্যে মহাশয় নিবিষ্ট হইয়া তামাক খাইতেছিলেন। নগেন তাঁহাকে বলিল—'চাটুজ্যে মশায়, আপনি সাবধানে চলাফেরা করবেন।'

বংশলোচন। উনি তো প্রবীণ লোক, ওঁকে ধরবে কেন ?

নগেন। মনেও ভাববেন না তা। চ্যবনপ্রাশ খাইয়ে তরুণ বানাবে, তারপর চালান দেবে।

উদয় সভয়ে বলিল 'তরুণদেরই ধরছে বুঝি ?'

চাটুজ্যে হুঁকা রাখিয়া বলিলেন 'উদো, তুই কি রকম লেখাপড়া শিখেছিস দেখি। জোয়ান যুবক আর তরুণ এদের মধ্যে তফাত কি বল্ তো।'

উদয়। জোয়ান হচ্ছে যার গায়ে খুব জোর। যুবক মানে যুবা, যাকে বলে ইয়ং ম্যান। তরুণ হ'ল গিয়ে মানে যাকে বলে— দাঁড়ান, অভিধান দেখে বলছি—

চাটুজ্যে। অভিধানে পাবি না, আজকাল মানে বদলে গেছে। আমি অনেক ভেবে চিন্তে যা বুঝেছি শোন্। যাঁর দাড়ি গোঁপ দু-ই আছে তিনি হলেন জোয়ান, যেমন রবি ঠাকুর, পি সি রায়। যাঁর দাড়ি নেই শুধুই গোঁপ তিনি যুবক, যেমন আশু মুখুজ্যে, গান্ধীজী। আর যাঁর দাড়িও নেই গোঁপও নেই তিনি তরুণ, যেমন বঙ্কিম চাটুজ্যে, শরৎ চাটুজ্যে আর এই কেদার চাটুজ্যে।

উদয়। আর আমি? নগেন মামা?

চাটুজ্যে। তোরা হলি ওই তিনের বার, যাকে বলে অপোগণ্ড। ধরতে হয় তোদেরই ধরবে।

উদয় চিন্তা করিয়া বলিল --'আমি দাড়ি রাখতুম, কিন্তু বউ বলে '

নগেন। খবরদার উদো, ফের যদি বউএর কথা পাড়বি তো কান ম'লে দেব।

চাকর আসিয়া বংশলোচনের হাতে একটা টেলিগ্রাম দিয়া গেল। বংশলোচন দেখিয়া বলিলেন- 'এ যে চাটুজ্যে মশায়ের নামে তার!'

চাটুজ্যে। আমাকে তার করলে কে? দেখ তো প'ড়ে কি ব্যাপার।

বংশলোচন। কার্তিক মিসিং—

উঁদয়। অ্যাঁ, বলেন কি?

বংশলোচন। চরণ ঘোষ টেলিগ্রাম করছেন মজিলপুর থেকে কার্ত্তিককে পাওয়া যাচ্ছে না, পুলিসে খবর দিতে বলছেন। পাঁচটার ট্রেনে চরণবাবু নিজেও আসছেন। ছ-টা তো বেজে গেছে, তা হ'লে এসে পড়লেন ব'লে। ওঁর কাছে সব শুনে পুলিসে খবর দেওয়া যাবে। কার্ত্তিকটি কে?

চাটুজ্যে। চরণের বড় ছেলে, এখানে হস্টেলে থেকে পড়ে, প্রতি শনিবারে দেশে যায়। এখন তো কলেজ বন্ধ, মজিলপুরেই তার থাকবার কথা।

নগেন। কার্ত্তিককে চুরি করবে এমন ছেলেধরা জন্মায় নি। ও সব বাজে খবর।

চাটুজ্যে। চিনিস নাকি কার্ত্তিককে?

নগেন। বিলক্ষণ চিনি, আমার সেজো শালা বাঁটলোর সঙ্গে এক ক্লাসে পড়ে। বিখ্যাত ছোকরা, শিশুকাল থেকেই বেশ চৌকস। যখন দশ বৎসর বয়েস তখন সে তার বান্ধবীদের বলত মেয়েগুলো আবার মানুষ! মাথায় এক গাদা চুল, আবার ফিতে বাঁধা, আবার শুধু শুধু দাঁত বার ক'রে হাসে। মারতে হয় এক ঘুঁষি! তারপর চোদ্দ বছর বয়সে সে তার প্রাণের বন্ধু বাঁটলোকে লিখলে- নারীর প্রেম? কখনই নয়। ভাই বাঁটলু, এ জগতে কারও থাকবার দরকার নেই, শুধু তুমি আর আমি। কিন্তু দু বছর যেতে না যেতে তার যৌবননিকুঞ্জের পাখি কা কা ক'রে উঠল।

কাত্তিক তার কবিতার খাতায় লিখলে--নারী, বুঝিতে না পারি কবে, একান্ত আমারি তুমি হবে, কত দিনে ওগো কত দিনে, পারছি নে আর পারছি নে।

বংশলোচন। এ সব তো ভাল কথা নয়। চাটুজ্যে মশায়, চরণবাবু ছেলের বিয়ে দেন না কেন?

চাটুজ্যে। বলেছি তো অনেকবার, কিন্তু চরণ বড় একগুঁয়ে। অন্য বিষয়ে সেকেলে হ'লেও ছেলের বিয়ে দেবার বেলায় সে একেলে। বলে, লেখাপড়া সাঙ্গ করুক, রোজগার করুক, তার পর বিয়ে। তবে কাত্তিকের জন্যে কনে ঠিক করাই আছে, চরণের বাল্যবন্ধু রাখাল সিংগির মেয়ে। তের-চোদ্দ বছর আগে দুই বন্ধুতে কথা স্থির হয়। তার পব রাখালবাবু মারা গেলেন, কিছুকাল পরে তাঁর স্ত্রীও গত হলেন, মেয়েটার ভার নিলে তার মামা। মামা শুনেছি কোথাকার জজ, সম্প্রতি রিটায়ার করেছেন।

নগেন। রাখাল সিংগির মেয়ে তো? কাত্তিক কখ্খনো তাকে বিয়ে করবে না, সে মেয়ে নাকি জংলী ভূত।

এমন সময় চরণ ঘোষ আসিয়া পৌঁছিলেন। প্রৌঢ় ভদ্রলোক, মাথায় একটি ছোট টিকি, কাঁচা-পাকা ছাঁটা গোঁপ, গলায় কণ্ঠি, এক হাতে ছাতা, অন্য হাতে ছোট ব্যাগ। চরণ হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন - 'পাজী হতভাগা!'

চাটুজ্যে। তা হ'লে ছেলের খোঁজ পেয়েছ? দুর্গা দুর্গতিনাশিনী।

চরণ। বকাটে মিথ্যুক ছুঁচো!

চাটুজ্যে। বিপত্তৌ মধুসূদনম্, ভগবান রক্ষা করেছেন।

চরণ। ব্যাটা আমার লেখাপড়া শিখছেন!

বংশলোচন। চরণবাবু, একটু শান্ত হ'ন।

চাটুজ্যে। আরে রাগ পরে ক'রো এখন। খবর কি আগে বল।

চরণ। খবর আমার মাথা। এখন কলেজ বন্ধ, গুড ফ্রাইডের ছুটি, কার্তিক ক-দিন আমার কাছেই ছিল, আমরাও নিশ্চিন্ত, মজিলপুরে তো আর ছেলেধরার উপদ্রব নেই। কাল সকালে বললে ফিলসফির খান-দুই বই বাঁটলোর কাছে রয়েছে, কলকাতায় গিয়ে নিয়ে আসি। আমি বললুম যাবি আর আসবি, দুপুরের গাড়িতে ফিরে আসা চাই। বেলা শেষ হয়ে গেল কিন্তু কাত্তিক ফিরল না, রাত্রি কাবার হ'ল তবু ছেলের খবর নেই। তার মা কান্নাকাটি শুরু করলেন, কারণ পরশু নাকি কলকাতায় তেষট্টিটা ছেলে চুরি গেছে। অগত্যা তোমায় একটা জরুরী তার ক'রে দিলুম, তারপর বিকেলের গাড়িতে চ'লে এলুম। প্রথমেই গেলুম বাঁটলোদের ওখানে। তার ছোট ভাই শাঁটলো বললে—বাঁটলো আর কাত্তিক কজন বন্ধুর সঙ্গে

ওভারটুন হলে বক্তৃতা শুনতে গেছে। কিন্তু বাঁটলোর বোন বললে শোনেন কেন, সব মিথ্যে কথা, বাবুরা অ্যাংলো-মোগলাই হোটেলে খেতে গেছেন, তার পর যাবেন সিনেমায়, তার পর অনেক রাত্রে ফিরে এসে দরজায় ধাক্কা লাগাবেন। হতভাগা, এই তোর ফিলসফির বই আনতে যাওয়া! এখন ছোঁড়াটাকে খুঁজে বার করি কি ক'রে?

বিনোদ। খবর যখন পেয়েছেন তখন আর খোঁজবার দরকার কি। ছেলে কলকাতায় এসেছে একটু ফুর্তি করতে, যথাকালে বাড়ি যাবে।

চরণ। ফুর্তি বার করব। হতভাগা এখানে এসেছে ইয়ারকি দিতে, আর আমরা ভেবে মরছি। কান ধ'রে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যাব। চাটুজ্যে, চল।

চাটুজ্যে। যাব কোথায়?

নগেন। ধর্মতলার মোড়ে অ্যাংলো-মোগলাই। ট্যাকসিতে চ'ড়ে সোজা চ'লে যান দশ মিনিটে পৌঁছবেন।

চরণ ঘোষ ও চাটুজ্যে মহাশয় বাহির হইলেন।

অ্যাংলো-মোগলাই হোটেলটি ছোট কিন্তু সুবিখ্যাত। আলোয় গন্ধে কলরবে ভরপুর। খোপে খোপে নানা লোক খাইতেছে, কেহ একলা, কেহ সদলে। দরজার

পাশে একটা ডেস্কের সামনে ম্যানেজার কখনও বসিয়া কখনও দাঁড়াইয়া চারিদিকে নজর রাখিতেছে এবং মাঝে মাঝে হাঁকিতেছে—তিন নম্বরে এক প্লেট কোর্মা, ছ নম্বরে ছুটো চা, চারটে কাটলেট শিগ্‌গির, পাঁচ নম্বরে আরো ছুটো ডেভিল ইত্যাদি।

চরণ ঘোষ ও চাটুজ্যে প্রবেশ করিলেন। চাটুজ্যে চুপি চুপি বললেন—'আস্তে, চেঁচিও না—ঐ যে বাবাজীরা ঐখানে খাচ্ছেন।'

চরণ ঘোষ নাক টিপিয়া বলিলেন 'রাধামাধব, এমন জায়গায় ভদ্রলোক আসে। যতসব রাক্ষস জুটে অখাদ্য খাচ্ছে।'

চাটুজ্যে। আরে চুপ চুপ। বেচারাদের অপরাধ নেই, হাজার বছর ধ'রে শুনে এসেছে এটা খেয়ো না, ওটা খেয়ো না। এখন যখন ভগবান সুবুদ্ধি আর সুবিধে দিয়েছেন তখন জন্মজন্মান্তরের অতৃপ্তি চটপট মিটিয়ে নিতে হবে। আহা, এদের ভোজন সার্থক হ'ক। এই যে এরা বাঘের মত গবগব ক'রে খাচ্ছে সেই সঙ্গে যেন বাঘের সদ্‌গুণও কিছু পায়। এদের গায়ে গত্তি লাগুক, মনে সাহস হ'ক, খোঁচা দিলে যেন খ্যাক ক রে নির্ভয়ে তেড়ে যেতে পারে।

ম্যানেজার বলিল—'আপনারা দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, ওই ছু নম্বরে বসুন দয়া ক'রে।'

চাটুজ্যে ঠোঁটে আঙুল দিয়া বলিলেন — 'চুপ, আস্তে আস্তে।'

ম্যানেজার সহাস্যে বলিল 'লজ্জা কি মোসাই, এখানে কত বুড়ো থুখুড়ে জজ মেজিষ্টর মহামহোপাধ্যায় পায়ের ধুলো দেন। আপনারা বরঞ্চ পর্দাটা টেনে দিয়ে বসুন। কি খাবেন মোসাই?'

চাটুজ্যে। অ, এখানে বুঝি অমনি বসা যায় না?

ম্যানেজার। হেঁ-হেঁ। খান-দুই কাটলেট দেব কি? অ্যাংলো-মোগলাইএর নবতম অবদান — মুরগির ফ্রেঞ্চ মালপো, কচি ভাইটো-পাঁটার ইষ্টু — দেখুন না একটু ট্রাই ক'রে।

চাটুজ্যে। না বাপু, অবদান খাবার আর বয়স নেই।

ম্যানেজার চরণ ঘোষের টিকি আর কণ্ঠি লক্ষ্য করিয়া বলিল -'ঠাকুরমোসাই, আপনাকে খান-দুই ডবল ডিমের রাধাবল্লভি দেবে কি?'

চরণ। দেবে আমার মাথা। ডাক ঐ রাক্ষসটাকে।

ম্যানেজার। রাক্ষস-টাক্ষস এখানে পাবেন না মোসাই, সব জেণ্টেলম্যান।

চাটুজ্যে। আরে কর কি চরণ, চুপ চুপ। নিজের ছেলেবেলার কীর্তিকলাপ সব ভুলে গেলে? সেই যে কাবাবের ঠোঙা নিয়ে গাব গাছে চ'ড়ে খেতে আর কোকিল ডাকতে তা কি মনে নেই? এখন না-হয় গোঁসাই মহারাজের কাছে

মন্তর নিয়ে কণ্ঠি ধারণ করেছ, মাংসের গন্ধে কানে আঙুল দাও। ছেলের খাওয়া শেষ হ'ক, তার পর একটু আধটু ধমক দিও। আপাতত এদিকে চুপটি ক'রে ব'স, একটু শরবত খেয়ে ঠাণ্ডা হও, আর শ্রীমানরা কি আলোচনা করছেন তাই আড়ি পেতে শোন, বিস্তর জ্ঞান লাভ করবে। যদি কিছু অশ্রাব্য অলৌকিক কথা কর্ণগোচর হয় তখন না-হয় গলা খাঁকার দিয়ে আত্মপ্রকাশ করা যাবে। ওহে ম্যানেজার, দুটো ঘোল দাও তো।

কার্তিক এবং তাহার তিন বন্ধু বাঁটলো গোপাল ও ঘনেন কিছু দূরে একটা পর্দার আড়ালে বসিয়া আছে। তাহাদের খাওয়া শেষ হইয়াছে, এখন তর্ক চলিতেছে।

গোপাল। আইডিয়াল একটা চাই বই কি, নয়তো লাইফটা কমনপ্লেস মনোটোনস হয়ে পড়ে। আইডিয়াল হচ্ছে মাইণ্ডের জুস, তাতেই জীবন সরস থাকে।

ঘনেন। মানলুম না। আইডিয়াল মানুষকে করে স্লেভ টু অ্যান আইডিয়া। আমি চাই ভ্যারাইটি, নো কমিটমেণ্ট। লোথারিওর সেই লাইনটা কি রে? টু পিক্ অ্যাণ্ড চুজ, প্লে ফাস্ট অ্যাণ্ড লূজ—তার পর কি যেন। বাঁটলো, তোর আইডিয়াল আছে নাকি?

চরণ ঘোষ চুপি চুপি বলিলেন—'এ সব কী বলছে হে চাটুজ্যে? কিছু বুঝতে পারছি না।

চাটুজ্যে। চুপ চুপ।

কার্তিক টেবিল চাপড়াইয়া বলিল—'আইডিয়াল টাইডিয়াল বুঝি না। আমি চাই বাস্তবের একটা সিন্‌থেসিস—এমন নারী, যে বল্লরী বাঁড়ুজ্যের মতন রূপসী, মিসেস চৌবের মতন সাহসী, জিগীষা দেবীর মতন লেখিকা, মেজদির ননদের মতন রসিকা, লোটি রায়ের মতন গাইয়ে, ফাখ্‌তা খাঁএর মতন নাচিয়ে।'

চাটুজ্যে বলিলেন 'ব্বাস রে! এমন তিলোত্তমা আমাদের চোদ্দ পুরুষ কখন দেখে নি। চরণ, আর কথাটি নয়, বাবাজীকে এই অঘ্রান মাসেই ঝুলিয়ে দাও, নইলে বেচারা বাড়ি-বাড়ি হ্যাংলা দিষ্টি দিয়ে বেড়াবে।'

চরণ ঘোষ লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন -'দাঁড়াও, হ্যাংলাপনা ঘুচচ্ছি। এই কাত্তিকে, হতভাগা ইষ্টুপিড ছুঁচো, কি কচ্ছিস এখানে? ছেলে আমার লেখাপড়া শিখছেন! অধঃপাতে যাচ্ছেন! যত সব বকাটে ছোঁড়াদের সঙ্গে ’

ঘনেন। খবরদার মশায় মুখ সামলে কথা কইবেন।

চরণ। ছুঁচোটাকে পই পই ক'রে বললুম—যাবি আর আসবি। সন্ধ্যে হয়ে গেল, ছেলের দেখা নেই। রাত্তির কাবার হ'ল, ছেলে আর আসে না। ছেলেধরার খপ্‌পরেই প'ড়ল, না মোটর চাপা প'ড়ল, না পুলিসে ধ'রে নিয়ে গেল—কিছুই জানি না। বাড়ির সবাই ভেবে অস্থির,

গর্ভধারিণী কেঁদেকেটে শয্যাশায়ী, আর ছেলে আমার হোটেলে ব'সে ইয়ারকি দিচ্ছেন! হতভাগা ছুঁচো ইষ্টুপিড। এই তোদের ইউনিভার্সিটির শিক্ষে? কি হয় সেখানে? যত সব জোচ্চোর মিলে ছেলেদেব মাথা খায়। আর অধঃপাতের আড্‌ডা হয়েছে এই হোটেল, যত বেহায়া ছেলে বুড়ো জুটে গোগ্রাসে গোস্ত গিলছে। এই বাঁটলোটা হচ্ছে দলেব সদ্দাব বিশ্ববকাট, ওই গোপ্‌লাটা হচ্ছে জ্যাঠাব চূড়ামণি, আর এই ঘনাটা একটা আস্ত বাঁদর।

কার্তিক ঘাড় হেঁট করিয়া গালাগালি হজম করিতে লাগিল. কিন্তু বন্ধুবা রুখিয়া উঠিল। হোটেলের ম্যানেজাব আস্তিন গুটাইতে লাগিল।

বাঁটলো ছেলেটি অতি মিষ্টভাষী ও বিনয়ী। সে খুব মোলায়েম করিয়া বলিল 'দেখুন চরণবাবু, নিজের ছেলেকে আপনি যা খুশি বলতে পারেন, কিন্তু আমবা কি করি না করি আপনার পিতার তাতে কি?'

ম্যানেজার বলিল 'জানেন, আপনাকে পুলিসে দিতে পারি?'

চরণ ঘোষ ভেংচাইয়া বলিলেন -- 'দাও না দেখি।'

ম্যানেজার। জানেন, এটা হচ্ছে অ্যাংলো-মোগলাই কেফ?

বাঁটলো ভুল উচ্চারণ বরদাস্ত করিতে পারে না। বলিল 'কেফ নয়, কাফে।'

ম্যানেজার। ওই হ'ল। জানেন, এটা হেঁজিপেঁজি জায়গা নয়, এটা একটা রেস্‌পেক্‌টেবেল রেষ্টাউরেন্ট ?

বাঁটলো। রেস্তোরাঁ।

ম্যানেজার। এক-ই কথা। জানেন, এটা হচ্ছে শিক্ষিত লোকের রেণ্ডেজভোঁশ ?

বাঁটলো। রাঁদেভু।

বার বার বাধা পাইয়া ম্যানেজার চটিয়া উঠিল। বলিল -'আরে থাম ডেঁপো ছোকরা। ডেভিল মামলেট কোপ্তা কোর্মা দেরাই বেচে বুড়িয়ে গেলুম, আর ইনি এলেন উরুশ্চারণ শেখাতে।'

বাঁটলো গর্জন করিয়া বলিল 'খদ্দেরকে অপমান? টেক কেয়ার, তোমার হোটেল বয়কট করব, কেবল কুকুরের ঠ্যাং আর সাপের চর্বি চালাচ্ছ।'

ঘরের এক কোণে একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন। ইনি একজন নীরব কর্মী, দুই প্লেট কোর্মা চুপচাপ শেষ করিয়া এখন রাই-সরিষা ও নেবুর রস দিয়া টোমাটো খাইতেছিলেন। বাঁটলোর কথায় চমকাইয়া উঠিয়া বলিলেন —'কী ভয়ানক, সেইজন্যই তো আমি ওসব খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি, কেবল জোচ্চুরি, ভাইটামিনের নামগন্ধ নেই।'

হোটেলের ভোক্তার দল আতঙ্কে চঞ্চল হইয়া উঠিল। অনেকে খাওয়া ফেলিয়া উঠিয়া পড়িল। কেহ বলিল—'অ্যাঁ, কুকুরের ঠ্যাং!' কেহ বলিল 'সর্বনাশ, ভাইটামিন নেই!' ম্যানেজার ব্যস্ত হইয়া করজোড়ে বলিতে লাগিল—'বসুন মোসাই বসুন, ওসব মিথ্যে কথায় কান দেবেন না আমার কি ধর্মভয় নেই!'

চাটুজ্যে মহাশয় উঠিয়া চারিদিকে চাহিয়া বলিলেন—'মহাশয়রা যদি অনুমতি দেন তো আমি ভাইটামিন সম্বন্ধে দু-চারটে কথা নিবেদন করি।'

কয়েকজন প্রবীণ ভদ্রলোক চোপ চোপ করিয়া ধমক দিয়া গণ্ডগোল থামাইয়া দিলেন। তাহার পর চাটুজ্যে মহাশয়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন 'হাঁ, তার পর মশায়, ভাইটামিনের কথা কি বলছিলেন?'

চাটুজ্যে বলিতে লাগিলেন—'বাল্যে দুগ্ধ, যৌবনে লুচি-পাঁঠা, বার্ধক্যে একটু নিমঝোল আর প্রচুর হরিনাম—এই হ'ল আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রসম্মত পথ্য। কিন্তু অ্যাদ্দিনে আমরা জানতে পেরেছি যে ওসব কেবল উদর পূরণের উপাদান মাত্র, ভাইটামিনই হচ্ছে আসল জিনিস, ভবনদীতে ভাসবার একমাত্র ভেলা, শিশু যুবা বৃদ্ধ সকলের পক্ষেই। অতএব ভাইটামিন যদি চান তো কাঁটাল খান।'

টোমাটো-ভোজী বাবুটি বলিলেন—কাঁটাল?'

চাটুজ্যে। আজ্ঞে হাঁ, কাঁটাল। কবি লিখেছেন—আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি, তোমার আকাশ তোমার বাতাস আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি, মরি হায় হায় রে। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবেন নাকো মশায়। এই ধরুন. হিমালয় পর্বত, যার জোড়া তুনিয়ায় নেই। তার পর ধরুন রয়াল বেঙ্গল টাইগার কে লড়বে তার সঙ্গে সিংহ? সাধ্য কি। তার পর ধরুন কাঁটাল।

টোমাটো-ভোজী। কাঁটাল কি একটা ফল হ'ল মশায়?

চাটুজ্যে। আজ্ঞে হাঁ, বটানি প'ড়ে দেখবেন। ফলের রাজা হচ্ছে কাঁটাল, তু-মন পর্যন্ত ওজন হয়, আবার কাঁটালের রাজা ওতরপাড়ার বঙ্কুলবাবুদেব গাছের রসখাজা। এক-একটি কোয়া এক-এক পো, কাঁচা সোনার বর্ণ, ভাইটামিনে টইটম্বুর। গালে দিয়ে বার-পাঁচেক এদিক ওদিক চালিয়ে রস অনুভব করুন, তার পর চক্ষু বুজে একটু চাপ দিন, অবলীলাক্রমে গন্তব্য স্থানে পৌঁছে যাবে। কোথায় লাগে আপনাদেব কালিয়া কোপ্তা কোর্মা।

টোমাটো-ভোজী। কোন্ ক্লাসের ভাইটামিন মশায়, এ বি সি না ডি?

চাটুজ্যে। এ-বি-সি-ডি, বি-এল-এ-ব্লে, স্লাই ফক্স মেট্ এ হেন্ যা বলেন, ডাক্তারী শাস্ত্রে কোনও বারণ নেই।

হেন বস্তু নেই যা কাঁটালে পাকেন না। গুঁড়ি চিকন, তক্তা হবে, হোগ্‌নি কাঠ তার কাছে তুচ্ছ। পাতা পাকিয়ে নিন, হুঁকোয় পরাবার উত্তম নল হবে। আর ফলের তো কথাই নেই। কোলে তুলে নিয়ে বাজান, পাখওয়াজের কাজ করবে। কাঁচার কালিয়া খান, যেন পাঁঠা। বিচি পুড়িয়ে খান, যেন কাবুলী মেওয়া। পাকা কোয়ার রস গ্রহণ ক'রে ছিবড়েটা চরকায় চড়িয়ে সুতো কাটুন, বেরোবে সিল্ক।

টোমাটো-ভোজী মুখ বাঁকাইয়া বলিলেন 'ননসেন্স্।'

চাটুজ্যে। বিশ্বাস হ'ল না বুঝি? তবে মরুন ঐ কাঁচা টোমাটো খেয়ে। আমরা চললুম, নমস্কার। ওঠ হে চরণ।

ম্যানেজার। ও মোসাই, দুটো ঘোলের দাম দিলেন না?

চাটুজ্যে। আরে মোলো, আবার দাম চায়? এত বড় একটা কুরুক্ষেত্র থামিয়ে দিলুম সেটা বুঝি কিছু নয়? আচ্ছা বাবা, নাও এই সিকি।

চাটুজ্যে মহাশয় চরণ ঘোষকে একটু আড়ালে টানিয়া আনিয়া বলিলেন—'ছেলেকে ধমক তো ঢের দিয়েছ, এইবার মিষ্টি কথায় শান্ত ক'রে ডেকে নিয়ে যাও। বাবা কাত্তিক, এস তো এদিকে একবার।'

চরণ ঘোষ বলিলেন—'শোন্ কাত্তিক, এই অঘ্রান মাস

তোর বিয়ে দেব। সেই রাখাল সিংগির মেয়ে নেড়ী, ছোটবেলায় তাকে দেখেছিলি, মনে আছে তো ?

কার্তিক মুখ ভার করিয়া বলিল 'নেড়ী-টেড়ীকে আমি বিয়ে ক'রব না।'

চরণ ঘোষ আবার খেপিয়া উঠিয়া বলিলেন 'করবি না কি রকম ? তোর ঘাড় ধ'রে বিয়ে দেব, অবাধ্য ইষ্টুপিড!'

চাটুজ্যে। আ হা হা, কর কি চরণ, তোমার কিছু আক্কেল নেই ? এই কি বিয়ের কথা বলবার সময়, না জায়গা ? যাও, তুমি আর মিছে দেরি ক'রো না, ন-টার ট্রেন এখনও পাবে। কার্ত্তিক আজ বাঁটলোদের বাড়িতে থাকবে। বাবা কার্ত্তিক, তোমার সঙ্গে দুটো কথা আছে।

চরণ ঘোষ গজগজ করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন। কার্তিক ও তাহার তিন বন্ধুর সঙ্গে চাটুজ্যে মহাশয় রাস্তায় আসিলেন।

ঘনেন বলিল 'এ অপমান কখনই সহ্য করা যায় না, আমরা বানের জলে ভেসে এসেছি নাকি ? কার্ত্তিক, তোর বাপকে এক্ষুনি উকিলের চিঠি দে, পাঁচ-শ টাকার ড্যামেজ। মকদ্দমায় আমরা সাক্ষী হব।'

গোপাল। বাপের নামে নালিশ দেখায় খারাপ, হাজার

হ'ক বাপ তো বটে। বরং খবরের কাগজে ছাপিয়ে দে, সমস্ত ছেলের দল খেপে উঠবে, বাছাধন টের পাবেন।

ঘনেন। উঁহু, তার চেয়ে জিগীষা দেবীর কাছে চল্, তাঁকে ব'লে ক'য়ে আমরা একটা আশ্রম খুলব। কাগজে ছাপাব — এস কে কোথায় আছ বাংলার ছেলেরা, নির্যাতিত উৎপীড়িত অসহায় বুভুক্ষু —

বাঁটলো। ঐ সঙ্গে একটা মেয়েদের বিভাগও খোলা উচিত ; কি বলিস কাত্তিক ?

কার্তিক করুণ স্বরে বলিল 'বাঁটলো, হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিডের দাম কত রে ?'

বাঁটলো। বিস্তর দাম, তার চেয়ে কেরাসিন তেল ঢের সস্তা, দশ পয়সাতেই কাজ সাবাড়।

কার্তিক। কিন্তু বড্ড জ্বালা করবে যে ?

বাঁটলো। সে কতক্ষণ ? একবার মরতে পারলে মোটেই টের পাবি না।

চাটুজ্যে মহাশয় কার্তিকের গায়ে হাত বুলাইয়া বলিলেন 'ছি বাবা কাত্তিক, দুঃখ্যু ক'রো না। একে বাপ, তায় বয়সে বড়, বললেই বা একটু কড়া কথা। বাপের সুপুত্তুর হ'লে সব দেবতা খুশী হন। এই দেখ, রামচন্দ্র পিতৃ-আজ্ঞায় বনে গিয়াছিলেন।'

ঘনেন। জব্দও হয়েছিলেন তেম্নি। মাথায় জটা,

গায়ে জামা নেই, পায়ে জুতো নেই, চোদ্দ বছর ভ্যাগাবণ্ড, বউ গেল চুরি। চল্ রে কাত্তিক, আমরা একবার জিগীষা দেবীর বাড়ি গিয়ে তাঁর বাণী নিয়ে আসি।

চাটুজ্যে। এত রাত্রে কেন আর তাঁকে বিরক্ত করা, তার চেয়ে এখন নিজের নিজের বাড়ি গিয়ে ঘুমও গে। বাণী নিতে হয় কাল নিও।

ঘনে। কোথায় রাত, এই তো সবে সাড়ে আটটা। আর করলাবাগান ফার্স্ট লেন তো পাশেই।

চাটুজ্যে। আচ্ছা চল বাবা। বড়োদের রাজত্ব শেষ হয়েছে, এখন ছোকরাদের পিছু পিছু দৌড়নোই বুদ্ধিমানের কাজ।

ঘনেন। আপনি আবার কি করতে যাবেন।

বাঁটলো। চলুন না উনিও, একজন মুরুব্বী লোক ডেপুটেশনে থাকা ভাল।

জিগীষা দেবীর বসিবার ঘরটি ছোট। মাঝে একটি টেবিল, তাহার পাশে গোটা কয়েক চেয়ার এবং একটা বেঞ্চ। ছেলেরা এবং চাটুজ্যে মহাশয় ঘরে প্রবেশ করিলে নাকে ঝুমকো পরা একজন নেপালী দাসী তাঁহাদের সম্মুখে দাঁড়াইল।

বাঁটলো বলিল 'চাটুজ্যে মশায়, আপনি হচ্ছেন আমাদের দলের সর্দার, দিন আপনার কার্ড পাঠিয়ে।'

চাটুজ্যে। কার্ড-ফার্ড আমার কোনও কালে নেই। ওগো ঝি, মাইজীকে গিয়ে খবর দাও কেদার চাটুজ্যে আর চার জন ছোকরা মোলাকাত করনে মাংতা।

ঘনেন। ছোকরা নয়, বলুন তরুণ।

চাটুজ্যে। হাঁ হাঁ, বোলো চারঠো তরুণ আর একঠো বুড্ঢা মাইজীর সাথ দেখা করেগা।

দাসী চোখ কুঁচকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল 'মেম-সাবকা সাথ?'

চাটুজ্যে। হাঁরে বাপু, জিঘাংসা দেবী।

ঘনেন ধমকাইয়া বলিল 'জিগীষা দেবী। চাটুজ্যে মশায়, আপনার ভীমরতি ধরেছে, ভদ্রমহিলার সামনে অসভ্যতা করবেন দেখছি।'

চাটুজ্যে। দেখ্ ঘনা, তুই আমার কাছে সভ্যতার বড়াই করিস না। কটা মহিলা দেখছিস্ তুই? জানিস, আমার তিন খুড়শাশুড়ী, চার শালাজ, সাত শালী আর গিন্নী তো আছেনই, এই চল্লিশ বৎসর তাঁদের সঙ্গে কারবার ক'রে আসছি?

দাসী খবর দিতে গেল। বাঁটলো বলিল—'চাটুজ্যে মশায়, আপনি আমাদের ডেপুটেশনের মুখপাত্র, আমাদের

বক্তব্যটা আপনিই বেশ গুছিয়ে বলবেন। ঘাবড়ে যাবেন না তো ?'

চাটুজ্যে। ঘাবড়াবার ছেলে কেদার চাটুজ্যে নয়।

জিগীষা দেবী ঘরে প্রবেশ করিলেন। রাশভারি মহিলা, দশাসই চেহারা, পাউডারের প্রলেপ ভেদ করিয়া সুগোল মুখের নিবিড় শ্যামকান্তি উঁকি মারিতেছে। কালিদাস যদি দেখিতেন তো লিখিতেন — খড়িপড়া ছাঁচি কুমড়া ইব।

জিগীষা দেবী বলিলেন 'আমাকে এখনি একটা কমিটি-মিটিংএ যেতে হবে, আপনারা একটু তাড়াতাড়ি বক্তব্য শেষ করলে বাধিত হব।'

বাঁটলো। বলুন চাটুজ্যে মশায়।

চাটুজ্যে মহাশয় গলা সাফ করিয়া আরম্ভ কবিলেন— 'মা-লক্ষ্মী, এই যে দেখছেন চার জন ছোকরা, এরা হচ্ছে চারটি তরুণ। এটির নাম কাত্তিক, হীরের টুকরো ছেলে। এর বাপ চরণ ঘোষের হচ্ছে পিত্তির ধাত, তাই মেজাজটা একটু তিরিক্ষি। তু-সন্ধ্যে ত্রিফলার জল খায়, কিন্তু কিছুই হয় না। চরণ ঘোষ কাত্তিককে বলেছে ছুঁচো, তাতে এঁরা

ঘনেন তাহার নোটবুক দেখিয়া বলিল—'তিন বার ছুঁচো বলেছে।'

চাটুজ্যে। ঠিক, তিন বারই ছুঁচো বলেছে বটে। তাতে এই বাবাজীরা সকলেই বড় মর্মাহত হয়েছেন। আমরা ছেলেবেলায় বাপ-জ্যাঠার গালাগাল বিস্তর খেয়েছি, সোনাপারা মুখ ক'রে সমস্ত সয়েছি। কিন্তু সে দিন আর নেই মশায়। তখন এই কলকাতায় ঘোড়ার ট্রাম চ'লত, ছেলেরা গোঁপ রাখত, কোটের ওপর উড়ুনি ওড়াত, মেয়েরা নোলক পরত আর নাইবার ঘরে লুকিয়ে গান গাইত, গবরমেণ্টকে লোকে তখন বলত সদাশয় সরকার বাহাদুর। যাক সে কথা। এখন আমি বলি কি —বাপ যদি ছেলেকে ছুঁচো ব'লেই থাকে তাতে ক্ষতিটা কি। ছুঁচো ভগবানের সৃষ্ট জীব, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তার একটা মহৎ উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই আছে। ছুঁচো তুচ্ছ প্রাণী নয়, ইঁদুরের চাইতে তার স্বভাব ভাল, মুখশ্রী ভাল, বুদ্ধিও বেশী। ইঁদুর সম্বন্ধে কবি বলেছেন — কাঠ কাটে বস্ত্র কাটে কাটে সমুদয়, কিন্তু ছুঁচোর এ বদনাম কেউ দিতে পারবে না। কি বলেন মা-লক্ষ্মী ?

জিগীষা দেবী ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—'তরুণের দলে আপনি কেন ?'

চাটুজ্যে মহাশয় একটু চিন্তা করিয়া উত্তর দিলেন —'সে একটা সমস্যা বটে, কিন্তু কথা হচ্ছে কি জানেন, আমি একজন প্রবীণ তরুণ।'

বাঁটলো। ওঁর বয়স হয়েছে বটে, কিন্তু মনটি একদম কাঁচা।

জিগীষা দেবী কিন্তু খুশী হইলেন না। চাটুজ্যে মহাশয় বিষয়টি পরিষ্কার করিবার জন্য বলিলেন—'কি রকম জানেন? এই গুজরাটী ডাব আর কি, ওপরটা ঝুনো, ভেতরটা নেয়াপাতি।'

ঘনেন তখন চটিয়া আগুন হইয়াছে। ধমকাইয়া বলিল—'চুপ করুন চাটুজ্যে মশায়, কেবল আবোল-তাবোল বকছেন। আমাকে বলতে দিন।—দেখুন, আমরা বড়ই অপমানিত নির্যাতিত হয়েছি, একেবারে পাবলিক হোটেলে দু-শ লোকের সামনে। কেন? যেহেতু আমরা পরাধীন, অভিভাবকের অন্নদাস। এই অবস্থা আর সহ্য হয় না, নিজেদের একটা স্বাধীন আশ্রম বানাতে চাই। পিঁজরে-ভাঙা চন্দনা চায় পাখনা মেলে বাঁচতে রে, অরুণ-রাঙা মুক্তাকাশের তক্তাপোশে নাচতে রে। আপনি যদি একটু চেষ্টা করেন তবে অনায়াসে একটা আশ্রম গ'ড়ে উঠবে। এখন এ সম্বন্ধে একটি বাণী আমরা আপনার কাছে প্রার্থনা করি।'

জিগীষা দেবী কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ হইয়া রহিলেন, তাহার পর শিস দিয়া ডাকিলেন—'সুষ্ সুষ্ '

একটি ছোট্ট প্রাণী গুটগুট করিয়া ঘরে আসিল। কুত্তা নয়। ইনি সুবেশবাবু, জিগীষা দেবীর স্বামী। রোগা, বেঁটে,

চোখে চশমা, মাথায় টাক, কিন্তু গোঁপ জোড়াটি বেশ বড় এবং মোম দিয়া পাকানো। সতী সাধ্বী যেমন সর্বহারা হইয়াও এয়োতের লক্ষণ শাঁখা-জোড়াটি শেষ পর্যন্ত রক্ষা করে, বেচারা সুষেণবাবুও তেমনি সমস্ত কর্তৃত্ব খোয়াইয়া পুরুষত্বের চিহ্ন স্বরূপ এই গোঁপ জোড়াটি সযত্নে বজায় রাখিয়াছেন। ঘরে আসিয়া ঘাড় নীচু করিয়া সবিনয়ে বলিলেন— 'ডেকেছ ?'

জিগীষা দেবী ছেলেদের দেখাইয়া বলিলেন—'এঁরা বাণী নিতে এসেছেন।'

সুষেণবাবু চোখ কপালে তুলিয়া বললেন 'বানি ? এই যে সেদিন ননি-সেকরা বিয়াল্লিশ টাকা নিয়ে গেল ?'

জিগীষা দেবী ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন, 'ঈডিয়ট ! সেকরার বানি নয়, আমার মুখের বাণী। যাও, সবুজ ফাউণ্টেন পেনটা আর এক শীট কাগজ নিয়ে এস।'

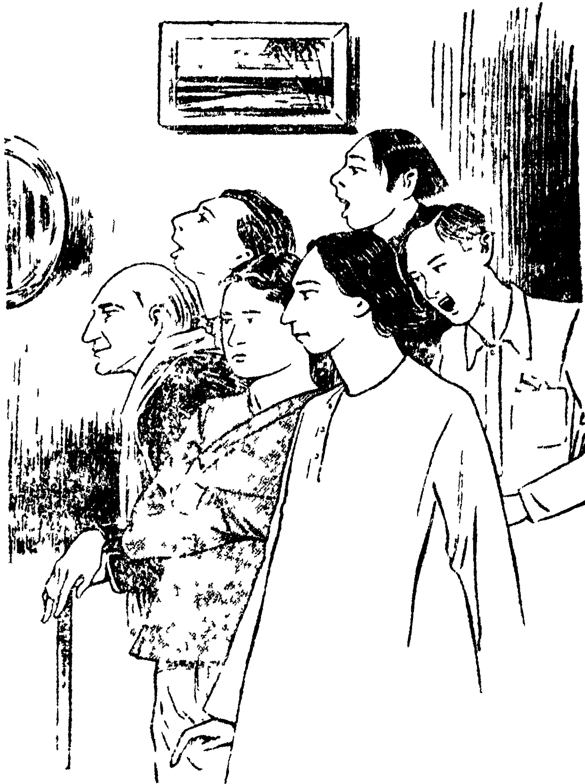
সুষেণবাবু কাগজ কলম আনিলেন। জিগীষা দেবী খচখচ করিয়া কয়েকটা লাইন লিখিয়া বলিলেন—'শুনুন।— ওগো ছেলেরা, আমি বুঝেছি তোমাদের ব্যথা, কিন্তু জগৎ পারবে না তা বুঝতে, কারণ স্থবিরের প্রাচীন-প্রস্তর-যুগ শেষ হয় নি এখনও। প্রবীণের রক্ত আর তরুণের খুন, ধনীর রুধির আর শ্রমীর লেহু, রেড়ির তেল আর ঝরনার জল কখনই মিশ খায় না। অতএব তোমাদের হ'তে হবে

স্বাবলম্বী স্বপ্রতিষ্ঠ। বানাও আশ্রম, গ্রামে গ্রামে, দেশে দেশে, নগরে নগরে। বানাও তারুণ্যের তপোবন, নবীন-



এরা বাণী দিতে এসেছে

তার নীড়, যৌবনের দুর্গ। তোল চাঁদা—লাখ, দশ লাখ, কোটি। আপাতত এনে দাও আমাকে হাজার দশেক, তাতেই কাজ আরম্ভ হ'তে পারবে।'



চাটুজ্যে মহাশয় বলিলেন—'বাঃ অতি চমৎকার, খাসা। বাঁটলো, কাগজখানা যত্ন ক'রে রেখে দিস। তবে আজকের মতন আসি মা-লক্ষ্মী।'

বাঁটলো। অসময়ে অনেক উৎপাত করলুম, মাফ করবেন।

জিগীষা। না না, উৎপাত কিসের। আচ্ছা, আমি এখন মিটিংএ যাচ্ছি, নমস্কার।

জিগীষা দেবী প্রস্থান করিলেন। চাটুজ্যে মহাশয়রাও উঠিলেন, কিন্তু সুষেণবাবু বলিলেন—'আপনাদের কি বড্ড তাড়া? বসুন না একটু।'

চাটুজ্যে। আপনিও একটা বাণী দেবেন নাকি?

সুষেণবাবু একবার দরজার বাহিরে উঁকি মারিয়া বলিলেন—'বাণী-ফানি আমি বুঝি না মশায়, ও হচ্ছে মেয়েলী ব্যাপার। আমি বুঝি শুধু কাজ। বলছিলুম কি —আপনারা কানাই ঘোষালকে চেনেন? চ্যাম্পিয়ন ওআন-লেগার, সেনেট হাউসের চাতালে নাগাড় পঁচাত্তর ঘণ্টা এক পায়ে দাঁড়িয়েছিল? আমার খুড়তুতো ভাই হয়।'

চাটুজ্যে। বটে?

সুষেণ। হাঁ। বলাই বাঁড়ুজ্যের নাম শুনেছেন? যে ছোকরা সেদিন গড়ের মাঠে তিনটে গোরাকে ছাতা-পেটা করছিল? আমার আপন মাসতুতো ভাই।

চাটুজ্যে। বলেন কি মশায়! আপনারা দেখছি বীরের বংশ, বড় সুখী হলুম আলাপ ক'রে। আর কিছু বলবার নেই তো? আচ্ছা, বসুন তা হ'লে, নমস্কার।

সুষেণবাবু সহসা মুখখানি করুণ করিয়া বলিলেন—'পাঁচটা টাকা হবে কি? মাসকাবার হ'লেই শোধ ক'রে দেব।'

বাঁটলো একটা আধুলি ফেলিয়া দিল। ছেলেদের দল ও চাটুজ্যে মহাশয় বাহিরে আসিলেন।

রাস্তায় আসিয়া চাটুজ্যে মহাশয় বলিলেন 'আর ভাবনা কি, কেল্লা মার দিয়া। এখন চট্‌পট আশ্রমের টাকাটা যোগাড় ক'রে জিগীষা দেবীর হাতে দাও। আচ্ছা, আমি এখন চললুম। কাত্তিক, তুমি তা হ'লে আজ রাত্রে বাঁটলোদের বাড়ি থাকছ? বেশ, কাল সকালে আবার দেখা হবে।'

চাটুজ্যে মহাশয় চলিয়া গেলে ঘনেন বলিল—'তাই তো, দ-শ হা-জার টাকা! কিন্তু এর কমে আশ্রম হবেই বা কি ক'রে। অন্তত পঞ্চাশ জনের থাকবার জায়গা চাই, শোবার ঘর ডাইনিং রুম ড্রয়িং রুম লাইব্রেরি টেনিস কোর্ট সমস্তই চাই, জিগীষা দেবী খুব কম ক'রেই এস্টিমেট

করেছেন। কিন্তু টাকা পাওয়া যায় কোথায়? বাঁটলো কি বলিস?'

বাঁটলো। আমি বলি কি—কাত্তিক আজ রাত্রে খুব ঠেসে খেয়ে নিয়ে কাল থেকে উপবাস আরম্ভ করুক, আর আমরা চারিদিকে সভা ক'রে বক্তৃতা দিই— হে দেশবাসী, এই যে একটি তরুণ আশ্রম বানাবার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে বসেছে আর তোমরা হেসে খেলে বেড়াচ্ছ, এটা কি ঠিক

? দাও দশ হাজার টাকা তুলে, তাহ'লেই বেচারা চাট্টি ভাত খাবে।

ঘনেন। উপোস ক'রে কাজ উদ্ধার করা হচ্ছে মেকী ট্যাকটিক্স, আমার তাতে সিমপ্যাথি নেই।

বাঁটলো। পুরুষোচিত পন্থা আছে, কিন্তু তাতে কিছু সময় লাগবে। কাত্তিক আমেরিকায় যাক, ঝাঁকড়া চুল রাখুক, স্বামীজী হয়ে জেঁকে বসুক। বিস্তর মেম ওর চেলা হবে, টাকাও আসবে ঢের। সেখানেই আশ্রম খোলা যাবে, আমরাও গিয়ে জুটব।

কার্তিকের এসব যুক্তি পছন্দ হইল না। বলিল—'বাঁটলো, পিস্তলের দাম কত রে?'

বাঁটলো ফেরিওয়ালার সুরে বলিল—'জাপানবালা দো আনা, জার্মানবালা দো আনা, সস্তাবালা দো আনা। পিস্তল কি হবে রে গাধা?

কার্তিক উত্তেজিত হইয়া বলিল 'ডাকাতি করব, খুন করব, জেলে যাব, ফাঁসি যাব, আত্মীয় স্বজনের নাম ডোবাব, জগৎ আমার শত্রু, কোথাও আমার স্থান নেই।'

বাঁটলো। আপাতত আমাদের বাড়িতে স্থান আছে। রাত্রিটা তো কাটিয়ে দে তার পর সকালবেলা মাথা ঠাণ্ডা হ'লে যা হয় করিস।

গোপাল ও ঘনেন নিজের নিজের বাড়ি গেল। কার্তিক নীরবে বাঁটলোর সঙ্গে চলিল। বাড়ি আসিয়া বাঁটলো কার্তিককে বাহিরের ঘরে বসাইয়া তাহার শুইবার ব্যবস্থা করিতে উপরে গেল। কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া দেখিল কার্তিক পালাইয়াছে।

রাত্রি দ্বিপ্রহর। বৃদ্ধ গোবিন্দবাবু দোতলার ঘরে খাটের উপর গভীর নিদ্রায় মগ্ন। সহসা তাঁহার চোখের উপর একটা তীব্র আলোক পড়ায় ঘুম ভাঙিয়া গেল। শুনিলেন, চাপা গলায় কে বলিতেছে 'খবরদার, চেঁচালেই গুলি ক'রব। লোহার আলমারির চাবি - শিগ্‌গির।'

গোবিন্দবাবু বুঝিলেন, আধুনিক চোর। একটা স্থবির চাকর ছাড়া বাড়িতে এখন দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই, তিনি নিজেও কয়দিন হইতে বাতে পঙ্গু হইয়া আছেন। অগত্যা বলিলেন

—'চাবি তো আমার কাছে নেই, গিন্নীর কাছে, তিনি আবার চন্দননগরে তাঁর ভাইএর বাড়ি গেছেন '

চোর। মনিব্যাগ ? ঘড়ি-টড়ি ? আংটি ?

গোবিন্দ। ঐ ডেসিং টেবিলটার টানার মধ্যে যা কিছু আছে। কিন্তু চেক বইখানা নিও না বাপু, সেটা তোমার কোনও কাজে লাগবে না।

টর্চের আলো ঘরের চারিদিকে ঘুরাইয়া চোর টেবিল খুঁজিতে লাগিল। অন্ধকারে সহসা টেবিলটায় ধাক্কা খাইয়া মেজেতে বসিয়া পড়িয়া চোর বলিল--'উঃ !'

গোবিন্দবাবু বলিলেন—'কি হ'ল ?'

সাড়া নাই। কিছুক্ষণ পরে চোর আবার 'উঃ' করিল। গোবিন্দবাবু ভাবিত হইলেন। খাটের পাশেই একটা বাতির সুইচ, সেটা টিপিয়া ঘর আলোকিত করিলেন। দেখিলেন, চোর টেবিলের পাশে মেজেতে বসিয়া আছে, তাহার কোমরে হাত, মুখে কাতর ভঙ্গী।

গোবিন্দবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন- 'তোমারও বাত নাকি ?'

চোর। উঁহু। মাস-দুই আগে ডেঙ্গু হয়েছিল, তার পর থেকে মাঝে মাঝে একটুতেই খিল ধরে। উঃ, উঠতে পারছি না।

গোবিন্দ। উঠতে পারবে একটু পরে। ওষুধপত্র খাচ্ছ ?

চোর। ডেঙ্গু যখন ছিল তখন খেতুম। এখন আর খাই না।

গোবিন্দ। অন্যায় করছ, ডেঙ্গু বড় খারাপ ব্যারাম। দিন-কতক তুলসীপাতার রস দিয়ে কুইনীন খেয়ে দেখ দিকি, ভারি উপকারী। যদি এ সময় পুরী কি দেওঘর গিয়ে থাকতে পার তো আরও ভাল।

চোর একটু হাসিয়া বলিল—'দেওঘর না শ্রীঘর ?'

গোবিন্দ। তাও তো বটে, বুড়ো মানুষ, ভুলেই গিয়েছিলুম যে তুমি একজন চোর। কিন্তু ভয় নেই, আইন-আদলত আমার ভাল লাগে না। সাজা যা দেবার আমিই দেব, তবে বাতে কাবু করেছে এই যা মুশকিল।

চোর এইবার একটু সুস্থ হইয়া আস্তে আস্তে উঠিল।

গোবিন্দবাবু। বলিলেন—'ব'স ঐ চেয়ারটায়।'

তরুণ চোর। পিছনে ওলটানো বড় বড় চুল, নাক-টেপা চশমা, তাহাতে দু-ইঞ্চি চওড়া কাল ফিতা, কাবুলী ফ্যাশনে ধুতি পরা, গায়ে রেশমী পাঞ্জাবি, পায়ে ক্যাম্বিসের জুতা, হাতে রিষ্ট ওআচ ও পিস্তল।

গোবিন্দ। ও পিস্তলটা কোথা থেকে পেলে ?

চোর। মুরগিহাটা থেকে, ছ-আনা দাম।

গোবিন্দ। খেলনা ? তবু ভাল, আর্মস অ্যাক্টে পড়বে না। স্বদেশী ডাকাত ?

চোর। ভবিষ্যতে তাই হয়তো হ'তে হবে। আপাতত ঝোঁকের মাথায়।

গোবিন্দ। বাপ নেই?

চোর। আছেন।

গোবিন্দ। তাড়িয়ে দিয়েছেন?

চোর। তিনি ঠিক তাড়ান নি, আমিই গৃহত্যাগ করেছি।

গোবিন্দ। ও, বুদ্ধদেব শ্রীচৈতন্যের মতন! কি হয়েছে বাপু, বৈরাগ্য?

চোর। বৈরাগ্য নয়, পৈতৃক জুলুম। বাবা হচ্ছেন সেকেলে জবরদস্ত পিতা। আজ সন্ধ্যাবেলা বন্ধুদের সঙ্গে অ্যাংলো-মোগলাই হোটেলে খাচ্ছি, হঠাৎ বাবা এসে খামকা যা-তা বলে গালাগালি দিলেন একেবারে দু-শ লোকের সামনে। তার পর বললেন এই কার্ত্তিক, অঘ্রান মাসে তোর বিয়ে, রাখাল সিংগির মেয়েব সঙ্গে। আমি জবাব দিলুম কখনই নয়।

গোবিন্দ। আর অমনি সিঁদকাঠি নিয়ে বেরিয়ে পড়লে?

চোর। আমার মনের অবস্থাটা আপনি বুঝতে পারছেন না সার। বাবা তো রেগে শেয়ালদ চ'লে গেলেন। আমি তখন ফিউরিয়স, বন্ধুরা নিয়ে গেল জিগীষা দেবীর কাছে – বিগ হামবগ। তার পর বাঁটলো আমাকে তাদের বাড়িতে

নিয়ে গেল। থাকতে পারলুম না, চুপি চুপি পালিয়ে এলুম, একটা কিছু ভয়ংকর করতে চাই চুরি, ডাকাতি, খুন।

গোবিন্দ। রাখাল সিংগির মেয়েটা বিশ্রী বুঝি ?

চোর। ভগবান জানেন আর বাবা জানেন। যার দেহের মনের কোনও সংবাদ আমি জানি না তাকে বিয়ে করি কি ক'রে বলুন তো ? পাড়াগেঁয়ে বাপ-মার মেয়ে, বিদেশে মামার কাছে মানুষ হয়েছে, মামা শুনেছি একটি আস্ত পাগল, ভাগনীটিকে নাকি বন্য জন্তু বানিয়েছেন। আমার মানসী প্রিয়া অন্য প্যাটার্নের, সিন্‌থেসিস অভ পার্ফেক্‌শন।

গোবিন্দ। কি রকম শুনি।

চোর সোৎসাহে বলিল 'শুনবেন ?' পাঞ্জাবির পাশের পকেট হইতে একটা মোটা খাতা টানাটানি করিয়া বাহির করিল।

গোবিন্দ। কি ওটা, সিঁদকাঠি ?

চোর। উহু, কবিতার খাতা। শুনুন।—জানতে চাও কি হৃদয়রানী, অদেখা ঐ মূর্তিখানি, রূপে গুণে কাল্‌চরেতে কেমন হ'লে ধন্য মানি—

গোবিন্দ। থাক থাক, আমি বুঝে নিয়েছি। সেই মেয়েটার নাম কি ?

চোর। ডাকনাম নেড়ী, ভাল নাম জানি না।

গোবিন্দ। আর তোমার নাম ?

চোর। কার্তিক ঘোষ।

গোবিন্দ। বল কি হে ? কার্ত্তিক ঘোষের হৃদয়খানা হবে নেড়ী ! নেলী হ'লেও বা কথা ছিল।

নীচে মোটর থামার অস্ফুট আওয়াজ হইল, তাহার পর ঘরের বাহিরের বারান্দায় খুট খুট পদশব্দ। গোবিন্দবাবু হাঁকিলেন 'কেরে নেড়ী এলি ? এত রাত হ'ল যে ?

বীণাবিনিন্দিত কণ্ঠে উত্তর আসিল—'মামা এখনও জেগে আছ ? ওঃ, কি ভোজটাই খাইয়েছে, পঞ্চাশটা কোর্স, একেবারে টপিং !'

একটি সালংকারা অনবদ্যাঙ্গী তরুণী ঘরে প্রবেশ করিয়া একজন অপরিচিত লোক দেখিয়া চিত্রার্পিতাবৎ দাঁড়াইল। চোর হাঁ করিয়া দেখিতে লাগিল।

গোবিন্দবাবু বলিলেন- 'হাঁ, তার পর কি বলছিল হে ছোকরা—রূপে গুণে কাল্‌চরেতে ? রূপ তো দেখতেই পাচ্ছ। গুণ আর কাল্‌চর ? নেড়ী, বানান কর তো প্রতিদ্বন্দ্বী।

নেড়ী বলিল—'পয় রফলা তয় হস্‌সি' ইত্যাদি। ইত্যবসরে চোর পিছন ফিরিয়া একটা ছোট আরশি পকেট হইতে বাহির করিয়া চট্‌ করিয়া মাথার চুল ঠিক করিয়া লইল।

গোবিন্দ। তুইএর স্কোয়ার রুট কত হয় রে ?

নেড়ী। 1.41425 · · ·

গোবিন্দ। বস্ বস্, ফিফ্‌থ প্লেস পর্যন্তই ঢের, কি বল হে ছোকরা। আচ্ছা নেড়ী, তোর মতে আধুনিক লেখকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কে ?

নেড়ী। যদি কঁতিনতাল অথর বল, তবে আঁরি মল্লার কাছে কেউ দাঁড়াতে পারে না। আধুনিক উপোসী সাহিত্যের ইনিই সবচেয়ে বড় এক্স্‌পনেণ্ট্। কেমন একটা করুণ বিশ্বলুট ভাব, যেন একটা দড়িছেঁড়া পিয়াসী বুভুক্ষা -- ভারি মিষ্টি লাগে কিন্তু। আর, এঁর ঠিক উল্‌টো হচ্ছেন জাপানী রেনেসাঁসের কবি সিমাৎসু ফুজিয়ামা। এঁর লেখায় কেমন একটা ঔদরিক ঔদার্য, যেন একটা পূর্তির পুলক, যেন একটা হৃষ্ট হ্রেষা—ভারি অবাক লাগে কিন্তু।

গোবিন্দ। আচ্ছা শেষের কবিতার শেষ কবিতার মোদ্দা কথাটা কি রে ?

নেড়ী। উৎকণ্ঠ আমার লাগি কেহ যদি প্রতীক্ষিয়া থাকে, সে-ই ধন্য করিবে আমাকে।

গোবিন্দ। বাঃ। এইবার তুই একটা কিছু বাজা দিকি।

নেড়ী একটা ব্যাঞ্জো লইয়া টুং টাং করিতে লাগিল। চোর গোবিন্দবাবুকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল—'নাইন্থ্ সিম্‌ফোনি বাজাচ্ছেন বুঝি ?'

গোবিন্দ। উঁহু, ওসব সেকেলে সুর নেড়ীর পছন্দ নয়, বোধ হয় শালা-লুট-লিয়া বাজাচ্ছে। নেড়ী, একটা রাশিয়ান ঠুংরি গা তো।

নেড়ী। যাও, এখন আমি পারি না, ঘুম পায় না বুঝি? আচ্ছা মামা, ইনি কে তা তো বললে না।

গোবিন্দ। ইনি একজন চোর। হঠাৎ কোমরে খিল ধরায় বাধা পেয়েছেন।

নেড়ী লাফাইয়া বলিল—'অ্যাঁ—চোর? এতক্ষণ ব'লতে হয়!'

ঘরের কোণে গিয়া চট্ করিয়া টেলিফোনটা তুলিয়া লইয়া নেড়ী বলিল—'পার্ক এট-সেভ্ন—হেলো বালিগঞ্জ থানা—'

গোবিন্দ। খবরদার নেড়ী, টেলিফোন রেখে দে—স্থির হয়ে ব'স্।

নেড়ী টেলিফোন রাখিয়া বলিল—'বা রে, চোরকে অম্নি ছেড়ে দেবে? তোমার সেই কুকুর-মারা চাবুকটা কোথায়, আমিই না হয় ঘা-কতক লাগিয়ে দিই—'

গোবিন্দ। এ আমার চোর, তুই মারবার কে!

নেড়ী চঞ্চল হইয়া বলিল—'তবে একটা দড়ি, বিছানা-বাঁধা স্ট্রাপ, কোথা আছে বল না মামা—বেঁধে ফেলি, নয়তো পালাবে—'



হেলো বালিগঞ্জ থানা!

চোর সবিনয়ে বলিল—'আজ্ঞে না না, আমি পালাব না।'

নেড়ী ব্যস্ত হইয়া দড়ি খুঁজিতে লাগিল, কিন্তু পাইল না।

চোর। আমার এই রুমাল দেখুন তো, যদি কাজ চলে

নেড়ী। নো, থ্যাংক্স্।

নেড়ী তাহার শাড়ির আঁচল দিয়া চোরকে পিঠমোড়া করিয়া বাঁধিল, চোর সুবোধ বালকের ন্যায় স্থির হইয়া রহিল। নেড়ী বলিল—'মামা, বেঁধে ফেলেছি, এইবারে থানায় টেলিফোন কর শিগ্‌গির।'

গোবিন্দ। আমার এখন ওঠবার ক্ষমতা নেই। কিন্তু চোরের সঙ্গে তুইও যে বাঁধা পড়লি!

নেড়ী অস্থির হইয়া বলিল—'আমি? কখ্‌নো নয়—উঃ আঁচলটা কি শক্ত, ছেঁড়া যায় না—একটা কাঁচি কাঁচি—'

চোর। দেখুন তো, আমার বুক-পকেটে আছে।

নেড়ী চোরের পকেট তল্লাশ করিল কিন্তু কাঁচি পাইল না।

চোর। আচ্ছা, পাশের পকেট দেখুন তো।

সেখানেও কাঁচি নাই। নেড়ী বলিল—'মিথ্যাবাদী জোচ্চোর!'

চোর বলিল—'আজ্ঞে না না। আচ্ছা আপনি বাঁধন খুলে দিন, আমি কথা দিচ্ছি পালাব না, অপন মাই অনার।'

নেড়ী। আহা কি কথাই বললেন, চোরের আবার অনার!

উপায়ান্তর না দেখিয়া নেড়ী বাঁধন খুলিয়া দিল।

গোবিন্দবাবু বলিলেন 'নেড়ী, যা লক্ষ্মীটি, খানকতক গরম গরম কাটলেট ভেজে আন, আর এক কাপ চা। আর পাশের ঘরে এঁর শোবার ব্যবস্থা ক'রে দে—এত রাত্রে বেচারা যায় কোথা।'

নেড়ী মামার আজ্ঞা পালন করিতে গেল।

গোবিন্দ। কেমন দেখলে কাত্তিক বাবাজী?

কার্তিক। চমৎকার! আশ্চর্য! এক্স্‌কুইজিট!

গোবিন্দ। মানসী প্রিয়ার সঙ্গে মিলছে?

কার্তিক। হুবহু। কিন্তু বাবা কি করবেন তাই ভাবছি। এ নেড়ী তো তাঁর মানসী নেড়ী নয়!

গোবিন্দ। কোনও ভয় নেই তোমার, আমার শিক্ষায় মোটেই খুঁত পাবে না। এই নেড়ী যখন শ্বশুরবাড়ি যাবে, তখন লাল চেলি প'রে এক হাত ঘোমটা টেনে পঞ্চাশটা গুরুজনকে ঢিপ ঢিপ ক'রে প্রণাম করবে, রান্নাঘরে গিয়ে কোমর বেঁধে দু-শ লোকের শাকের ঘণ্ট রাঁধবে। আবার ওকে যদি সিমলা দিল্লিতে ভাইসরয়ের ডান্সে নিয়ে যাও তবে লাট-বেলাটের সঙ্গে অক্লেশে বার-কুড়িক নেচে দেবে, জার্মান কনসলের কানে চিমটি কাটবে, সার্ জম্বুস্বামী আয়ারের টিকি ধ'রে টানবে।

কার্তিক। ওঃ।

গোবিন্দ। কিহে, ভয় পেলে নাকি?

কার্তিক। আজ্ঞে না, আনন্দ আনন্দ!

১৩৩৬—১৩৩৭

প্রেমচক্র

'এখনও বল্ হাবলা।'

'হাঁ হাঁ, আমি বলছি তুমি ফেলে দাও মামা।'

'কিন্তু লোকে কি বলবে?'

'ভালই বলবে।'

'তোর মামী?'

'মামী খুশী হবে, তুমি দেখো।'

'তুই না-হয় একবার ওপরে গিয়ে জিজ্ঞেস ক'রে আয়।'

'তা আসছি। তুমি ততক্ষণ বেশ ভিজিয়ে নরম ক'রে রাখ।'

হাবলা ওপরে গেল। আমি বুরুশ ঘষতে লাগলুম। হুকুম এলেই জয়-মা-কালী ব'লে চোপ বসাব।

কিন্তু শুভকর্মে অনেক বাধা। হাবলার ছোট ভাই বঙ্কা ঝড়ের মতন ঘরে ঢুকে বললে 'ওকি হচ্ছে মামা?'

'কি আবার হবে, গোঁপটা ফেলে দেব।'

বঙ্কা বললে—'গোঁপ এখন থাকুক। দাও খাঁ ক'রে একটা গল্প লিখে। একটা মাসিক পত্রিকা বার করেছি—চিরন্তনী।'

'ক-মাস বার হবে?'

'চিরকাল। এ পত্রিকা মরবে না, তুমি দেখে নিও। দস্তুরমত এস্টিমেট ক'রে আটঘাট বেঁধে নামা হচ্ছে। পঁচিশজন নামজাদা লেখকের সঙ্গে কনট্রাক্ট করেছি। প্রতি সংখ্যায় উনিশটা গল্প—পাঁচটা সোজা প্রেম, দশটা বাঁকা প্রেম, চারটে লোমহর্ষণ। প্রথম সংখ্যা প্রায় ছাপা হয়ে এল, কেবল শেষ ফর্মার লেখাটা যোগাড় হয়ে ওঠে নি তাই তোমার শরণাপন্ন হয়েছি। দাও চট্‌পট্‌ একটা লিখে।'

'কেন তোর কনট্রাক্টারদের কাছে যা না।'

'তাদের খোশামোদ করবার আর সময় নেই, তুমিই একটা লিখে দাও, আজই চাই কিন্তু।'

এমন সময় হাবলা ফিরে এল। মুখখানা হাঁড়ির মতন ক'রে বললে 'মামী রাজী নয়।'

'কি বললে?'

'বললেন – খবরদার, ঐ তো মুখের ছিরি, গোঁপ ফেললে দেখাবে যা, মরি মরি! মামা, অমন মুষড়ে গেলে চলবে না কিন্তু। প্রতিশোধ নিতে হবে, ভীষণ প্রতিশোধ। আমি বলছি তুমি দাড়ি রাখ, দিব্যি মুখ-ভরা কোমর পর্যন্ত, নিরঞ্জন সিংএর মতন।'

বঙ্কা অস্থির হয়ে বললে—'আঃ, কেবল গোঁপ আর দাড়ি! তার চেয়ে ঢের বড় জিনিস সৃষ্টি করবার আছে। মামা, তুমি অন্য চিন্তা ত্যাগ ক'রে গল্প লেখ।'

হাবলা বললে—'তোদের সেই পত্রিকাটার জন্যে বুঝি?'

বঙ্কা জবাব দিলে না। সে তার দাদাকে গ্রাহ্য করে না, কারণ হাবলা একটু সেকেলে গোছের, আর বঙ্কা হচ্ছে খাজা-তরুণ। আমি বললুম—'বঙ্কার পত্রিকার এক ফর্মা খালি রয়েছে, তুই একটা লেখা দে না হাবলা।'

হাবলা বললে—'কবিতা চায় তো দিতে পারি। পুঁটুর বিয়ের জন্যে একটা লিখেছি, তাই একটু অদলবদল ক'রে দিলে চলবে।'

বিয়ের পদ্যে হাবলার হাত খুব পাকা। তার বন্ধুরা বলে, এ লাইনে ও-ই এখন সম্রাট্। হাবলাদের রাবণের বংশ, জেঠতুতো খুড়তুতো পিসতুতো মামাতোর অন্ত নেই, তার সমস্ত তাল সামলায় শ্রীমান্ হাবুলচন্দ্র। বছরের মধ্যে গোটা-পাঁচেক হৃদয়বাণী, গণ্ডা-দুই মর্মোচ্ছ্বাস, ছ-সাতটা প্রীতি-উপহার তাকে লিখতেই হয়। ভাষা ছন্দ ভাব তিনটেই বেশ স্ট্যাণ্ডারডাইজ ক'রে ফেলেছে। আজি কি সুন্দর প্রভাত, নীল নভে পূর্ণচন্দ্র উঠিছে, মলয় মৃদু হিল্লোলে বহিছে, কুসুম থরে থরে ফুটিছে, হৃদয়ে শাহানা রাগিণী বাজিছে। কেন এ সব হচ্ছে? কারণ, আমাদের স্নেহের পুঁটুরানীর সঙ্গে শ্রীমান্ চামেলিরঞ্জন বি. এস-সির শুভ-

পরিণয়। অতএব হে বিভু, তুমি প্রচুর মধুলেপন ক'রে এই দুটি তরুণ হিয়া জুড়ে দাও।

কিন্তু বঙ্কার তা পছন্দ নয়। বললে—'রাবিশ। ওসব সেকেলে ছড়া একদম চলবে না।'

আমি বললুম—'খুব চলবে। এই কবিতাই কিছু অদলবদল ক'রে দিলে আধুনিক হয়ে দাঁড়াবে। দু-চারটে ভূমা, গোটা-তিন অবদান, একটু রুদ্র শিহরন, একটু রিনকিঁ-ঝিনি—'

বঙ্কা তিড়বিড় ক'রে হাত-পা নেড়ে বললে—'না না না। ওসব পচা কবিতা একদম চলবে না। মামা, তুমি গল্প লেখ, বেশ ঘোরালো প্লট চাই, শিগ্‌গির দিতে হবে কিন্তু।'

বললুম—'আচ্ছা আচ্ছা, তাই হবে।'

'ছবিও চাই কিন্তু।'

'বলিস কিরে! আমার চোদ্দপুরুষ কখনও ছবি আঁকে নি।'

'বাঃ, সেই যে তুমি ঘোষ কোম্পানির আপিসে ছবি আঁকতে?'

কথাটা নেহাত মিথ্যে নয়। চার বার বি. এ ফেল হবার পর বাবার উপরোধে দিন-কতক এঞ্জিনিয়ার ঘোষ কোম্পানির আপিসে প্ল্যান আঁকা শিখি। কত রকম যন্ত্র, কত রকম রং। আমি মনের সুখে সেট-স্কোয়ার দিয়ে পুকুর

আঁকতুম আর কম্পাস দিয়ে চাঁদামাছ আঁকতুম। ঘোষ-সাহেব দেখেও দেখতেন না, পিতৃবন্ধু কিনা। বঙ্কা সেই থেকে ঠাউরেছে আমি একজন আর্টিস্ট। তা হোক, একটু চেষ্টা করলে যদি একাধারে লিখিয়ে আর আঁকিয়ে হ'তে পারি তো মন্দ কি। বঙ্কাকে বললুম—'কাল সন্ধ্যাবেলা আসিস, দেখি কি করতে পারি।'

পরদিন সন্ধ্যা হ'তে না হ'তে বঙ্কা এসে হাজির। সঙ্গে আবার তার ছোটবোন চিংড়িকে এনেছে। সে ফার্স্ট-ইয়ারে পড়ে, গল্প আর ছবির একজন মস্ত সমঝদার। জিজ্ঞাসা করলুম—'হাবলা এল না?'

বঙ্কা বললে—'দাদা ভীষণ চটেছে। বললে, দেখি আমাকে বাদ দিয়ে তোদের পত্রিকা ক-দিন চলে। দাদা ম্যালেরিয়া-বধ কাব্য শুরু করেছে, শ্যাওড়াপুলি-হিতৈষীতে ক্রমশ প্রকাশ্য। যাক, তুমি চট্‌পট প'ড়ে ফেল মামা। লেখাটা এখনি ছাপাখানায় দিতে হবে, ছবির ব্লক করাতে হবে। নাও, আরম্ভ কর।'

আরম্ভ করলুম।—

'স্থান—নৈমিষারণ্যের ঋষিপাড়া। কাল—সত্যযুগ। পাত্র—তিন ঋষিকুমার, হারিত জারিত আর লারিত। পাত্রী—তিন ঋষিকন্যা, সমিতা জমিতা আর তমিতা।'

বঙ্কা বললে—'সত্যযুগে গেলে কেন? আধুনিক যুগ হ'লেই বেশ হত, প্রেমের পথে কোন বাধা পেতে না। যদি বর্তমান যুগধারার সঙ্গে তোমার পরিচয় না থাকে তবে বৌদ্ধ মুঘল আমল চালাতে পারতে।'

বললুম—'তুই কতটুকু খবর রাখিস? যদি হৃদয়ের অবাধ প্রসার আর কল্পনার উদ্দাম প্রবাহ দেখাতে হয় তবে সত্যযুগে প্লট ফাঁদতেই হবে।'

চিংড়ি বললে—'যেমন কচ ও দেবযানী।'

'ঠিক। চিংড়ি, তুই সব জানিস দেখছি।'

চিংড়ি খুশী হয়ে উত্তর দিলে- 'মামা, তুমি কারও কথা শুনো না, চালাও সত্যযুগ।

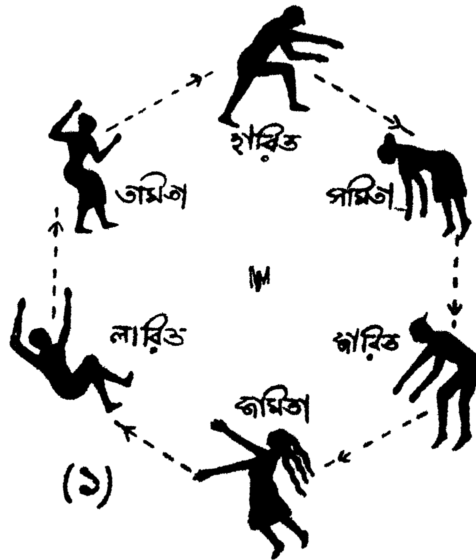
'চালাবই তো। তার পর শোন্। হারিত ভালবাসে সমিতাকে, কিন্তু সমিতা চায় জারিতকে। আবার জারিত চায় জমিতাকে, অথচ জমিতার টান লারিতের ওপর। আবার লারিত ভালবাসে তমিতাকে, কিন্তু তমিতার হৃদয় হারিতের প্রতি ধাবমান।'

বঙ্কা বললে—'ভয়ংকর গোলমেলে প্লট, মনে রাখা শক্ত।'

'মোটেই না। এক নম্বর চিত্র দেখ।'

চিংড়ি বললে -- 'উঃ, করেছ কি মামা! এ যে ইটার্নাল ট্র্যাংগ্‌লের বাবা, হোপলেস হেক্সাগন! আচ্ছা মামা, মধ্যিখানে এটা কি এঁকেছ, চামচিকে?'

'চামচিকে নয়। ইনি হচ্ছেন খোদ কন্দর্প। অতনু কিনা, তাই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না। লেন্স দিয়ে দেখলে টের পাবি, ওঁর দুই হাতে ধনুক, তার ছিলের এক প্রান্ত খোলা, তাই দিয়ে ডাইনে বাঁয়ে ওপর নীচে সপাসপ চাবুক লাগাচ্ছেন, আর প্রেমচক্র বন্‌বন ক'রে ঘুরছে।'



(১)

চিংড়ি বললে—'বন্‌বন সেকেলে ভাষা। বাঁইবাঁই লেখ, অথবা পাঁইপাঁই।'

'ঠিক। প্রেমচক্র বাঁইবাঁই অথবা পাঁইপাঁই ক'রে ঘুরছে। এই চক্রের বাইরে আর একটি মূর্তি আছেন, তিনি

হলেন ভুশুণ্ডিল মুনি। ব্রহ্মচর্য শেষ করার পর গৃহী হবার জন্য কিছুদিন চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কোনও ঋষিকন্যাই এঁকে বিয়ে করতে রাজী হয় নি, কারণ ভুশুণ্ডিল যেমন মোটা তেমন গম্ভীর, আর তাঁর বয়স প্রায় চার হাজার বৎসর, অর্থাৎ



(২)

এই কলিযুগের হিসেবে চল্লিশ। অবশেষে তিনি বুঝলেন যে এই দৃশ্যমান জগৎটা নিছক মায়া, আর নারী সেই মায়া-সমুদ্রের ভুড়ভুড়ি, তাদের আকার আছে কিন্তু বস্তু নেই। তখন তিনি আশ্রম ত্যাগ ক'রে নিবিড় অরণ্যে গিয়ে নাসি-

কাগ্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে কঠোর তপস্যা শুরু করলেন। দু নম্বর চিত্র দেখ।'

চিংড়ি বললে—'মামা, এবার আমাদের বার্ষিক উৎসবে তোমার গল্পটা অভিনয় করব। সরসী-দি যদি ভুশুণ্ডি মুনি সাজেন, ওঃ, কি চমৎকার মানাবে! গোঁপ লাগবে না, শুধু চাট্টি দাড়ি আনালেই চলবে। তার পর প'ড়ে যাও মামা।'

'একদা বসন্তসমাগমে যখন বনভূমি রমণীয় হয়ে উঠেছে, অশোক কিংশুক কুরুবক পুন্নাগ প্রভৃতি তরুরাজি পুষ্পভারে নমিত হয়েছে, ভ্রমরের গুঞ্জন আর কোকিলের কূজন বুড়ো বুড়ো তপস্বীদের পর্যন্ত উদ্‌ব্যস্ত ক'রে তুলেছে, তখন এক মধুর অপরাহ্ণে সমিতা জমিতা আর তমিতা তিন সখীতে মিলে গোমতী-তীরে বায়ু সেবন করতে করতে মনের কথা আলোচনা করছিল। ঠিক সেই সময়ে হাত-তিরিশ পিছনে একটি আম্রকাননের অন্তরালে হারিত জারিত আর লারিত ঘাসের ওপর ব'সে আড্ডা দিচ্ছিল।'

চিংড়ি বললে – 'ঋষিকন্যাদের সাজ কি রকম তা লিখলে না?'

'হচ্ছে, হচ্ছে। — সত্যযুগে বস্ত্র বড়ই দুর্মূল্য ছিল। ঋষিকন্যারা একখানি সাদাসিদে খাপী বল্কল পরিধান

করতেন, আর একখানি 'শৌখিন মিহি বল্কল গায়ে তেড়চা ক'রে বাঁধতেন।'

চিংড়ি বললে—'খুব আর্টিস্টিক সাজ। আচ্ছা মামা, স্টেজে ব্রাউন রঙের জর্জেট প'রলে ঠিক বল্কলের মতন দেখাবে না?'

'নিশ্চয়। তার পর শোন্।—ঋষিপত্নীদের সাজও ঐরকম। মাথায় কাপড় টানবার উপায় ছিল না, লজ্জা প্রকাশ করবার দরকার হ'লে কিঞ্চিৎ জিহ্বা প্রদর্শন করতেন। উঁচুদরের মুনিঋষিরা, যাঁরা রাগ-দ্বেষ-শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে উঠতেন, তাঁদের কিছুই দরকার হ'ত না; তবে তাঁরা লোকালয়ে যেতে পারতেন না, কুকুর ঘেউ ঘেউ করত। সাধারণ ঋষিরা বল্কলই ধারণ করতেন, কিন্তু ছেলে-ছোকরা-দের ব্যবস্থা ছিল বেল-কাঠের কৌপীন।'

বঙ্কা বললে—'বেল-কাঠের?'

'হাঁ। কর্তারা বলতেন—তোদের এখন ব্রহ্মচর্যের সময়, বেশী বিলাসিতা ভাল নয়। তোরা বেদ পড়বি, ধেনু চরাবি, কাঠ কাটবি, বনে-বাদাড়ে ঘুরে হরদম বল্কল ছিঁড়বি। কাঁহাতক যোগাব? তার চেয়ে কাঠের কৌপীন পরিধান কর, তোদের পুত্রপৌত্রাদিক্রমে টিকবে।

বঙ্কা বললে—'কিন্তু কাছা দেবে কি ক'রে?'

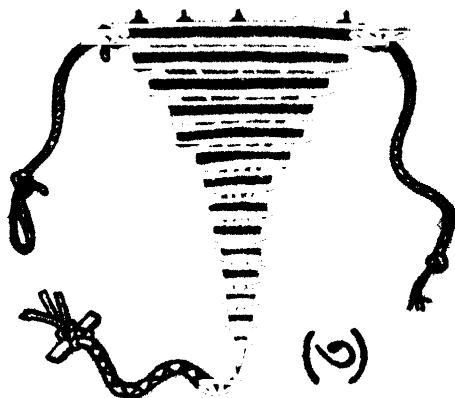
'কেন দেবে না। তিন নম্বর চিত্র দেখ।'

চিংড়ি বললে—'ও! রোল-টপ টেবিলের মতন।'

'ঠিক বুঝেছিস। চিংড়ি, তোর মাথা একদম ক্লিয়ার।'

চিংড়ি বললে—'কিন্তু মামা, তোমার এ গল্প অভিনয় করা চলবে না।'

বঙ্কা বললে—'বেল-কাঠের জন্যে ভাবছিস? কিচ্ছু দরকার নেই, জাকল-কাঠ হ'লেও চলবে, ফুট-লাইটে ঠিক বেল-কাঠ ব'লে মনে হবে।'



চিংড়ি বললে—'প'ড়ে যাও মামা।'

'জারিত বলছিল—সখা, প্রাণ যে যায়।

লারিত বললে—তাই তো দেখছি। কি একগুঁয়ে মেয়ে সব! আরে, আমাদের ভালই যদি বাসিস তবে অমন গুলিয়ে ফেললি কেন? কিন্তু একটা কথা না ব'লে থাকতে পারছি না। তমিতার জন্য ম'রে আছি দাদা; কিন্তু জমিতা

যে আমাকে চায় তাতে আনন্দও হয়। আহা, যদি দুটিকেই পেতুম।

হারিত ঘাড় নেড়ে বললে—ঠিক, ঠিক। পঞ্চশরের কি বিচিত্র লীলা!

লারিত বললে আচ্ছা হারিত-দা, ওদের জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে গিয়ে রাক্ষসবিবাহ করলে কেমন হয়?

হারিত বললে -দূর বোকা, আমরা যে ঋষির সন্তান। হয় ব্রাহ্মবিবাহ না হয় গান্ধর্ববিবাহ, এ ছাড়া অন্য বিধি নেই। চল্, আর একবার ওদের বুঝিয়ে দেখি।

ওদিকে নদীর ধারে পায়চারি কবতে করতে জমিতা বলছিল- সখী, যৌবন যে যায়!

তমিতা উত্তর দিলে -যায় যাক গে, তা ব'লে তো স্বৈরিণী হ'তে পাবি না। হৃদয় যাকে চায় না তাকে মাল্যদান ক'রব কি কবে? কিন্তু লারিত বেচাবার জন্য সত্যি আমার দুঃখ হয়, কেনই বা আমাকে চায় সে!

জমিতা বললে—অতই যদি দরদ তবে গলায় মালা দিলেই পারিস। আমাবও এক জ্বালা হয়েছে কেনই বা মরতে সেদিন বেনারসী বল্কলটা পবেছিলুম, জারিত বেচারার তো দেখে দেখে আশ মেটে না। কিন্তু লারিত-দার কোনও পছন্দ নেই, কেমন যেন একরকম।

তমিতা বললে—আহা চটো কেন জমিতা-দি, জারিতকে

তো আর কেড়ে নিচ্ছি না। তাকে আজীবন ভাই বলতে পারি, দাদা বলতে পারি, ঠাকুরপো বলতে পারি, কিন্তু প্রাণনাথ বলতে শুধু হারিত-দা।

একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে সমিতা বললে—কিন্তু সে যে আমাকেই চায়। আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়া গেছে।

এমন সময় তিন বন্ধু এসে উপস্থিত। হারিত সম্ভাষণ করলে — কিগো বরবর্ণিনীরা, কি হচ্ছে?

তমিতা একটু জিহ্বাবিলাস ক'রে বললে—এই যে আসুন, নমস্কার।

হারিত বললে—আর কত কাল আমাদের কষ্ট দেবে, দয়া কি হয় না? সমিতে, একবারটি হাঁ বল।

জারিত জড়িত স্বরে বললে—জমিতে, সাড়া দাও।

লারিত হাঁকলে—তমিতে, আমি যে তোমার তরে ম'রে আছি প্রিয়ে!

তমিতা স'রে গিয়ে বললে—ও হারিত-দা, দেখ না কি বলছে!

হারিত বললে—অন্যায় কিছু বলে নি। তুমি লারিতকে ধন্য কর, জমিতা জারিতকে করুক আর সমিতা আমাকে।

সমিতা বললে—সে হ'তেই পারে না। আমরা হৃদয় বিলি ক'রে ফেলেছি, তার আর নড়চড় নেই।

হারিত বললে—একটা রফা করা যায় না? ভগবান কন্দর্পকে না-হয় মধ্যস্থ মানা যাক।

জমিতা আর তমিতা প্রথমটা এ প্রস্তাবে রাজী হ'ল না। কিন্তু সমিতা তাদের বুঝিয়ে দিলে—দেখাই যাক না কন্দর্প কি করেন, আমরা তো আর নিজেদের মত বদলাচ্ছি না।

কন্দর্প নিকটেই ছিলেন, পাঁচ মিনিট আবাহন করতেই দেখা দিলেন। সব শুনে বললেন—দেখ, এ বিসংবাদ তোমরা নিজেরাই মিটিয়ে ফেল। আমার কী বা ক্ষমতা, শুধু প্রজাপতির আদেশে পঞ্চবাণ মোচন করি। তার আঘাত যদি তোমাদের পছন্দসই না হয় তো আমি নাচার।

লারিত বললে—আপনি প্রেমচক্রে একটা উল্‌টো পাক লাগিয়ে দিন না!

হারিত বললে—দূর গর্দভ, তাতে শুধু উল্‌টো বিপত্তি হবে, প্রেমচক্র দক্ষিণাবর্তে না ঘুরে বামাবর্তে ঘুরবে, আমি চাইব তমিতাকে, তমিতা চাইবে লারিতকে—এই রকম বিপরীত অবস্থা দাঁড়াবে, তাতে কোনও পক্ষের মনস্কামনা পূর্ণ হবে না।

সমিতা কন্দর্পকে বললে—আপনি অতি বেয়াড়া লোক, ছুটি নিরীহ তরুণ-তরুণীকে খামকা চরকি ঘোরাচ্ছেন। কি সুখ পাচ্ছেন এতে?

জমিতা ঘাড় বেঁকিয়ে বললে—আমরা অভিশাপ দেব কিন্তু, তখন মজা টের পাবেন।

তমিতা কিল তুলে বললে—লাগাও না দু-চার ঘা লারিত-দা।

বেগতিক দেখে কন্দর্প চট্ ক'রে স'রে পড়লেন।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে। হারিত বললে,—আজ আমরা বিদায় নি, রাত্রে আবার বৃহদারণ্যক আগাগোড়া মুখস্থ করতে হবে। কাল বিকেলে এসে ফের আমাদের আবেদন জানাব।

ঋষিকুমাররা চ'লে গেলে সমিতা অনেকক্ষণ ভেবে বললে—দেখ, কন্দর্প বেঁচে থাকতে এই প্রেমচক্রের ঘুরপাক থামবে না। চল, আমরা মহাদেবকে গিয়ে ধরি, তিনি আর একবার মদনভস্ম করুন।

জমিতা মেয়েটি খুব হিসেবী। বললে উঁহু। পঞ্চশরের ভস্ম যদি ভুবন-মাঝে ছড়িয়ে পড়ে তবেই চিত্তির, যেখানে সেখানে ব্যাঙের ছাতার মতন প্রেম গজিয়ে উঠবে। একবারে সাবাড় না করলে নিস্তার নেই।

তমিতার উপস্থিতবুদ্ধি সব চেয়ে বেশী। সে বললে—ভগবান্ রাহুকে ধর, তিনি কপ্ ক'রে গিলে ফেলুন।

সমিতা আর জমিতা লাফিয়ে উঠে বললে—সেই খাসা হবে। চল এক্ষুনি রাহুর কাছে যাই।'

বঙ্কা বললে — 'ছাই গল্প হচ্ছে। শাস্ত্রের কথা না-হয় মেনে নিলুম যে রাহু একটা গ্রহ, আকাশে থাকে। কিন্তু মেয়েরা তার কাছে যাবে কি করে? যত সব গাঁজা-খুরি।'

চিংড়ি ধমক দিয়ে বললে—'তুমি থাম ছোড়দা। এটা যে সত্যযুগ সে খেয়াল আছে? প'ড়ে যাও মামা।'

'রাহু তখন আকাশে নিরিবিলিতে ব'সে পাঁজি দেখছিলেন। মেয়েদের দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—কি চাই? চট্ ক'রে ব'লে ফেল, আমার সময় বড্ড কম।

সমিতা হাতজোড় ক'রে বললে—প্রভু, আমরা প্রেমে পড়েছি।

রাহু ফিক ক'রে হেসে বললেন—মাইরি? তা আমাকে কেন। আমি শূন্যপথে ধাই, চাঁদ-সুয্যি খাই, প্রেমের আমি কিবা জানি। দেখছ তো, আমার শুধুই মুণ্ডু, তাতে প্রেম হয় না। প্রেম চাও তো ইন্দ্রাদি দেবতার কাছে যাও, তাঁদের ওই ব্যবসা।

সমিতা নিবেদন করলে—প্রভু, আপনাকে হৃদয় দেব এমন ভাগ্য আমরা করি নি। আমরা মানুষকেই ভালবেসেছি, কিন্তু কন্দর্প সমস্তই ওলটপালট ক'রে দিচ্ছেন। তিনি ধ্বংস না হ'লে আমাদের স্বস্তি নেই। আপনি কৃপা ক'রে তাঁকে গ্রাস করুন।

রাহু মাথা নেড়ে বললেন -- সইবে না, সইবে না।
চাঁদ পর্যন্ত আমার হজম হয় না, গিলতে না গিলতে বেরিয়ে যায়। কন্দর্প খেলে পেট ফাঁপবে।

তমিতা বললে পেট তো আপনার দেখছি না।

রাহু ধম্‌কে বললেন- হাঁ, তুই সব জানিস! আধ্যাত্মিক উদব শুনেছিস? আমার তাই।

জমিতা বললে প্রভু, তবে আমাদের তিনটিকে ভক্ষণ করুন, বেঁচে আর সুখ নেই।

রাহু একটু বিষণ্ণ হাসি হেসে বললেন্ হজমের কি আর শক্তি আছে রে। শুধু লঘুপথ্য খেয়ে বেঁচে আছি, হ'ল একটু চাঁদের কুচি, হ'ল বা গরম গরম এক কামড় সুয্যি আচ্ছা, কাছে আয়, দেখি একটু তোদের গাল চেটে।

তমিতা বললে --কি যে বলেন!

তবে এলি কি করতে? যা, এখন পালা, আমার খাবার লগ্ন হ'ল।

রাহু তাঁর লকলকে গোঁপ দিয়ে খপ্ ক'রে পূর্ণচন্দ্র ধরলেন, তার পর তাতে একটু মাখন মাখিয়ে কামড় দিলেন। চার নম্বর চিত্র দেখ। মেয়েরা সে করুণ দৃশ্য সইতে পারলে না, ছুটে পালাল।

মহামুনি ঔড়ব হচ্ছেন নৈমিষারণ্যের বড় আশ্রমের কুলপতি। তাঁর দশ-হাজার শিষ্য, বিশ-হাজার ধেনু। যজ্ঞশালায় রোজ আড়াই-শ মন নীবার ধানের চাল রান্না হয়, আর তিন-শ ঝুড়ি উড়ুম্বরের তরকারি। ঔড়ব অত্যন্ত রাশভারী ঋষি, আশ্রমবাসীরা তাঁর ভয়ে তটস্থ।



সকালবেলা হারিত জারিত আর লারিত বেদাধ্যয়ন করতে এসেছে। ঔড়ব জলদগম্ভীর স্বরে ডাকলেন—হারিত।

আজ্ঞে।

এসব কি শুনছি? তোমরা নাকি আশ্রমকন্যাদের পিছু পিছু ঘুরে বেড়াও? জান, এটা হচ্ছে তপোবন, ইয়ারকির জায়গা নয়? এখন তোমাদের ব্রহ্মচর্যের সময়, সে খেয়াল আছে?

সত্যযুগে মিথ্যে কথা লোকে বড় একটা কইত না। হারিত হাতজোড় ক'রে স্বীকার করলে—প্রভু, আমরা অপরাধ করেছি।

তবে প্রায়শ্চিত্ত কর। তিনজনে গোমুখী তীর্থে চ'লে যাও, নিরন্তর গোসেবা, সদ্যোজাত গোময় আহার, কবোষ্ণ গোমূত্র পান, এই ব্যবস্থা। তাতে চিত্তশুদ্ধি পিত্তশুদ্ধি পাপমোচন একযোগে হবে। একটি বৎসর নৈমিষারণ্যের ত্রিসীমানায় এসো না।

হারিত জারিত আর লারিত গুরুদেবের চরণবন্দনা ক'রে বিষণ্ণ মনে বিদায় হ'ল।

একদিন প্রাতঃকালে কন্দর্প হিমালয়ের পাদদেশে কিন্নরমিথুন শিকার করতে গেছেন। ইতস্তত বিচরণ করতে করতে হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল একটা মস্ত উই-ঢিবি উঁচু হয়ে রয়েছে, তার উপর পোকা বিজবিজ করছে। কেমন সন্দেহ হ'ল। গোটা দুই বাণের খোঁচা দিতেই পনর ইঞ্চি

উই-মাটির স্তর খ'সে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে ভিতর থেকে মানুষের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর শোনা গেল—অহো, কুসুমশর কি দুঃসহ !

কন্দর্প বললেন—ভুশুণ্ডিল মুনির গলা শুনছি না ?

বল্মীকের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে ভুশুণ্ডিল বললেন আমার তপস্যা ভঙ্গ করলে কেন হে ? ভস্ম ক'রে ফেলব।

কন্দর্প বললেন—আরে দাঁড়াও ঠাকুর, এখন গোসা রাখ। বেজায় কাহিল হয়ে গেছ যে ! নাও, এই দিব্য মকরন্দটুকু খেয়ে ফেল। গায়ে বল পাচ্ছ ? বেশ বেশ, আর একটু খাও ! তার পর, কিসের জন্য তপস্যা হচ্ছিল ?

ভুশুণ্ডিল উত্তর দিলেন—তপস্যা আবার কিসের জন্য করে ? মোক্ষলাভের জন্য।

মোক্ষ এখন থাকুক। দিব্যকান্তি চাও ? তপ্তকাঞ্চন-বর্ণ চাও ? রমণীর মন হরণ করতে চাও ?

ভুশুণ্ডিল একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে বললেন—কিন্তু তপস্যার কি হবে ?

তপস্যা এখন থাক না। দিন-কতক ছুটি নাও, ফুর্তি কর।

ভুশুণ্ডিল ভেবে দেখলেন, এ রকম তো অনেক মহামুনিই করে থাকেন, পরাশর বিশ্বামিত্র ব্যাসদেব। তাতে আর দোষ কি। বললেন আচ্ছা, রাজী আছি, কিন্তু এক বৎসরের বেশী নয়।

কন্দর্প বললেন—মোটে ? বেশ, তাই হবে। আমি বর দিচ্ছি, ভুবনমোহন রূপ ধারণ কর। বৎসরান্তে আবার স্মৃতি ফিরে পাবে, তখন যত খুশি তপস্যা ক'রো, কেউ বাধা দেবে না।

ভুণ্ডিলের আপাদমস্তকে একটা তারুণ্যের প্লাবন ব'য়ে গেল। কাঁচা-পাকা জটাজুট উড়ে গিয়ে মাথায় ভ্রমর-বিনিন্দিত কৃষ্ণ কেশ ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া গজিয়ে উঠল। একটা অদৃশ্য ক্ষুর চরর্ ক'রে মুখমণ্ডল নির্লোম ক'রে দিলে, রইল শুধু দু-পাশে দুটি কচি কচি জুলপি। ছাতাপড়া নড়া দাঁত খটাখট উপড়ে গিয়ে দু-পাটি দন্তরুচিকৌমুদী ফুটে উঠল। কটিতটে শুভ্র পট্টবাস জড়িয়ে গেল, কাঁধে চড়ল আপীত উত্তরীয়, গলায় মল্লিকার মালা, হাতে মোহন মুরলী, সর্বাঙ্গে দিব্যকান্তির পলেস্তারা। ভুণ্ডিল একটি লম্ফ দিয়ে হুংকার ছেড়ে বললেন ভো বিশ্বচরাচর, শৃণ্বন্তু, আমি আছি,—তোমরাও আছ, এইবার দেখে নেব।

কন্দর্প বললেন—অতি পাকা কথা। আচ্ছা, এইবার ওই সুদূর নৈমিষারণ্যে দৃষ্টিনিক্ষেপ কর।

ভুণ্ডিল তাই করলেন। আহ্লাদে আটখানা হয়ে বললেন—আহা, কি দেখলুম!

কি দেখলে ?

তিনটি পরমাসুন্দরী তরুণী গোমতীসলিলে স্নান করছে।

প্রাণে পুলক জাগছে ?

জাগছে।

হিয়ায় হিল্লোল উঠছে ?

উঠছে।

চিত্ত চুলবুল করছে ?

করছে।

চিংড়ি বললে 'মামা, এইখানটা ভারী গ্র্যাণ্ড লিখেছ কিন্তু।'

'হুঁহুঁ, এখনই হয়েছে কি। পবে দেখবি আবও মধুব, আরও মর্ম্মস্পর্শী। তাব পব শোন্।

কন্দর্প বললেন ভুণ্ডিল।

আজ্ঞে।

কোন্‌টিকে পছন্দ হয় ?

ঠিক করতে পারছি না যে।

আচ্ছা, ওই যেটি তন্বী, দীর্ঘকায়া, পদ্মকোরকবর্ণা, রাজহংসীর মতন যার গলা ?

অতি সুন্দব।

আর যেটি সুমধ্যমা, চম্পকগৌরী, মদমুকুলিতাক্ষী, দোহারা গড়ন, টুকটুকে ঠোঁট ?

চমৎকার।

আর ওই বেঁটেটি, শ্যামাঙ্গী, চঞ্চলা, চকিতমৃগনয়না, বেশ মোটা-সোটা, টেবো টেবো গাল?

ওটিও খাসা।

ব'লে ফেল কোন্‌টিকে চাও।

আজ্ঞে তিনটিকেই।

কন্দর্প ভুণ্ডিলের পিঠ চাপড়ে বললেন—সাধু ভুণ্ডিল সাধু! তবে আর দেরি ক'রো না, সোজা নৈমিষারণ্যে চ'লে যাও, গোমতীর তীরে ব'সে তোমার ওই বাঁশিটি বাজাও গে।

সমিতা জমিতা আর তমিতা বিকেলবেলা গোমতীর ধারে ব'সে নৈমিষারণ্যের বিখ্যাত চিঁড়েভাজা খাচ্ছে। হঠাৎ একটা করুণ বেসুরো বাঁশির আওয়াজ কানে এল। সমিতা এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখতে পেলে, একটি লোক কশ্যপ-ঘাটে ব'সে তাদের দিকে চেয়ে বাঁশি বাজাচ্ছে।

সমিতা বললে—কে ওই তরুণ? আগে তো দেখি নি কখনও।

জমিতা বললে—কেন বাঁশি বাজাচ্ছে কে জানে। কেমন যেন উদাস সুর।

তমিতা বললে—সুন্দর চেহারাটি কিন্তু।

সমিতা বললে—তোর হারিত-দার চেয়েও সুন্দর?

তমিতা ভ্রুভঙ্গী ক'রে বললে—কি যে বল! হারিত-দা জারিত-দা লারিত-দার চাইতে বুঝি কারও সুন্দর হ'তে নেই!

মেয়েরা অন্যমনস্ক হ'য়ে আড়চোখে দেখতে লাগল।—আচ্ছা চিংড়ি, আড়চোখে চাওয়া কি রকম ক'রে আঁকতে জানিস?'

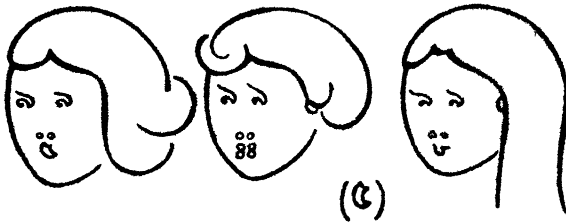
চিংড়ি বললে—'খুব সোজা। একটা আণ্ডার মতন আঁক। মাথায় ইচ্ছেমত চুল বসাও। কপালে নিরেনব্বই লেখ, তার নীচে একটা কাত-করা বিসর্গ, তার নীচে একটা পাঁচ। যদি দাঁত দেখাতে চাও তবে চুয়াল্লিশ বসাও। আর যদি মোনা-লিসার ধরনের নিগূঢ় হাসি ফোটাতে চাও তবে আট লেখ।'

'বাঃ ঠিক হয়েছে। পাঁচ নম্বর চিত্র দেখ। তার পর শোন্।—

একটি বৎসর দেখতে দেখতে কেটে গেল। হারিত জারিত আর লারিত প্রায়শ্চিত্ত শেষ ক'রে তীব্র আশা আর দারুণ উৎকণ্ঠা নিয়ে নৈমিষারণ্যে ফিরে এল। মেয়েদের সংবাদ কি? তারা কি এখনও নিজেদের গোঁ বজায়

রেখেছে? এই বৎসরব্যাপী বিচ্ছেদের ফলে তারা কি প্রেমের সোজা পথটি খুঁজে পায় নি, মনে একটুও প্রতিদান-স্পৃহা জাগে নি? হবেও বা।

কিন্তু খবর যা শুনলে তা মর্মান্তিক। সমিতা জমিতা তমিতা তিন জনেই ভুণ্ডিলকে মাল্যদান করেছে। হা রে কন্দর্প, এই কি তোর মনে ছিল? প্রেমচক্রে বৃথাই এতদিন ঘুরপাক খাওয়ালি? হায় হায়, কেন তারা মেয়েদের মতেই সায় দেয় নি, সে তো মন্দের ভাল ছিল। আর মেয়ে তিনটেরও ধন্য রুচি, শেষে কিনা ভুণ্ডিল!



হারিত মাথা চাপড়ে বললে—ওঃ স্ত্রীচরিত্র কি কুটিল! ওদের কিস্সু বিশ্বাস নেই।

জারিত হাত নেড়ে বললে - একেবারে যাস্‌সেতাই।

লারিত দাড়ি ছিঁড়ে বললে — তিনটি বস্‌সর নাহক ভুগিয়েছে মশাই।

তিন উদ্দাম প্রেমিক উর্ধ্বশ্বাসে ছুটল ভুণ্ডিলের বাড়ি।

ব্যাটাকে ঠেঙিয়ে মনের জ্বালা দূর ক'রতে হবে, তাতে মহামুনি ঔড়ব ভস্মই করুন আর তির্যগ্‌যোনিতেই পাঠান।

ভুণ্ডিলের কুটীরে কেউ নেই, শুধু প্রাঙ্গণে একটি আশ্রমব্যাঘ্রী তৃণভোজন করছে আর তিনটি হরিণশিশু তার স্তন্য পান করছে। এই স্নিগ্ধ শান্ত আশ্রমসুলভ দৃশ্য দেখে ঋষিকুমারদের হুঁশ হ'ল, অহিংসার কাছে কিছু নাই। হারিত ব্যাঘ্রীটিকে একটু আদর ক'রে সঙ্গীদেব বললে—যা হবার তা তো হয়ে গেছে, দৈবই সর্বত্র বলবান্। কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ। মিথ্যা ঋষিহত্যা ক'রে কি হবে, চল আমরা গোমুখী তীর্থে ফিরে গিয়ে পরমাত্মাকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করি।

সংসারে বীতরাগ হয়ে তারা আবার উত্তর মুখে চলল। কিন্তু দৈবের মতলব অন্য রকম। একটু যেতে না যেতে তারা দেখতে পেলে বটগাছের তলায় একটি বল্মীকস্তূপ, সমিতা জমিতা আর তমিতা তার উপরে ঝাঁটা চালাচ্ছে।

একটি সলজ্জ ম্লান হাসি হেসে তমিতা বললে এই যে, আসুন, নমস্কার। ভাল আছেন তো? কবে এলেন?

হারিত বললে—ভদ্রে, এ কি?

অবনতমস্তকে সমিতা উত্তর দিলে এই উই-টিপির মধ্যে আছেন। কাল বিকেল পর্যন্ত বেশ স্বাভাবিক অবস্থায় ছিলেন, কত গল্প কত হাসি কত গান। যেমন সূর্যাস্ত

হ'ল, অমনি হঠাৎ কেমন একটা কাঁপুনি ধ'রল, আর চেহারাটাও এক মূহূর্তে বিকট কাল মোটা হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মাথায় এক রাশ জটা আর মুখভরা বিশ্রী দাড়ি-গোঁপ। আমরা তো ভয়ে পালিয়ে গেলুম। তার পর খুঁজে খুঁজে পেলুম এই বটতলায় বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে তপস্যা করছেন। অনেক ডাকাডাকি করতে একবার চোখ মেলে চাইলেন, ধম্‌কে বললেন -খবরদার, ভস্ম ক'রে ফেলব। দেখতে দেখতে সর্বাঙ্গে উই লেগে মাটির প্রলেপ জমে গেল, দেখুন না, একদিনেই আগাপাস্তলা চাপা প'ড়ে গেছে। আমরা কি আর করি, তিন জনে ঝাঁটা বুলিয়ে উই তাড়াচ্ছি।

হাবিত বললে — না না না অমন কাজও ক'রো না, তাতে ওঁর তপস্যার হানি হবে। উই অত্যন্ত উপকারী প্রাণী, তপশ্চর্যার একটি প্রধান অঙ্গ, বাহ্য বিষয় রোধ ক'রে মনকে অন্তর্মুখ করতে অমন আর দুটি নেই।

জারিত বললে - -তা ছাড়া, উই-মাটি ভেঙে গিয়ে যদি ভিতরে হাওয়া ঢোকে, তবে চ'টে গিয়ে বিলকুল ভস্ম করে ফেলবেন।

লারিত বললে — ওঃ, কি জোচ্চোর হৃদয়হীন তপস্বী, তিন-তিনটে তরুণীকে ভাসিয়ে দিলে!

তমিতা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বললে—ওগো সেই বাঁশিতেই সর্বনাশ করেছে।

জমিতা গদ্‌গদ কণ্ঠে ডাকলে — ও হাঁরিদ্দা জারিদ্দা লারিদ্দা !

হারিত বললে—ভয় কি, আমরা তিন জনেই আছি। ওঁকে আর ঘাঁটিয়ে কাজ নেই, কল্পান্ত পর্যন্ত সমাধিস্থ হয়েই থাকুন। তোমরা আমাদের সঙ্গে হিমালয়ে চল, সেইখানেই আশ্রম নির্মাণ করা যাবে।

কিন্তু আমরা যে সতী, হারিত-দা !

আমরাই কোন্ অসৎ। চল চল, বেলা ব'য়ে যায়।

বঙ্কা বললে— 'থামলে কেন মামা, তার পব ?'

'তাব পর আব নেই। তোব মামী আব লিখতে দেয় নি।'

'আঃ মামীর যদি কিছু আক্কেল থাকে !'

চিংড়ি বললে— 'এ মামীব ভাবী অন্যায় কিন্তু। সত্য-যুগে কী না হ'তে পাবে। আচ্ছা, তোমার তো মনে আছে, শেষটা মুখে মুখেই বল না, আমি লিখে নিচ্ছি।'

'উঁহু, একদম গুলিয়ে গেছে, যে তোর মামীর ধমক।'

বঙ্কা বললে — 'তোমাব মরাল কাবেজ কিচ্ছু নেই। দাও আমাকে, আমিই শেষ ক'রব।'

১৩৩৯

দশকরণের বানপ্রস্থ

দর্ভাবতীর রাজা দশকরণ একদিন রাজসভায় পদার্পণ ক'রেই বললেন, 'আমার পঞ্চাশ বৎসর বয়স পূর্ণ হয়েছে, কালই আমি বানপ্রস্থে যাব।'

বৃদ্ধমন্ত্রী আকাশ থেকে পড়ে বললেন, 'সে কি মহারাজ, আপনি এখনও যুবা, চুল পাকে নি, দাঁত পড়ে নি, শরীর অজর, বাহু সবল, বুদ্ধি তীক্ষ্ণ, কি দুঃখে কালই বনে যাবেন? এখন বিশ বৎসর ওকথা তুলবেন না।'

রাজা ঘাড় নেড়ে বললেন, 'না, আমার যাওয়াই স্থির। কুমারের অভিষেক আজই হ'য়ে যাক। উৎসবটা পরে করলেই চলবে।'

মন্ত্রী বললেন, 'হা, কি দুর্দৈব! মহারাজ, হঠাৎ এমন মত কেন আপনার হ'ল? দর্ভাবতী রাজ্যের অবস্থাটা ভেবে দেখুন। রাজপুত্র এখনও বালক, সবে বাইশ বৎসরে পড়েছেন, আমিও জরাগ্রস্ত। রাজ্যচালনা কি আমাদের কাজ? কুমার, তুমি মহারাজকে বুঝিয়ে বল না।'

কুমার নতমস্তকে উত্তর দিলেন, 'আমি আর কি বলব। পিত যদি ধর্মার্থে তৃতীয় আশ্রম গ্রহণ করেন তবে আমি

তাতে বাধা দিয়ে পাপের ভাগী কেন হব। তাঁর পদানুসরণ ক'রে অগত্যা আমিই রাজ্য চালাব।'

যুবমন্ত্রী বললেন, 'আর আমরাও তো আছি, ভয় কি।'

বৃদ্ধমন্ত্রী তখন হতাশ হয়ে স্থবির রাজপুরোহিতকে বললেন, 'ধর্মজ্ঞ মাণ্ডূক, এই সংকটে একমাত্র আপনিই মহারাজ দশকরণকে সদ্‌বুদ্ধি দিতে পারেন।'

মাণ্ডূক বললেন, 'মহারাজ পঞ্চাশোর্ধ্বে বনপ্রস্থান নৃপতির পক্ষে অবশ্যকৃত্য নয়। দশরথ অতি বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত রাজ্য শাসন করেছিলেন। যযাতি দু বার জরাগ্রস্ত হয়েও সিংহাসন ছাড়েন নি। যদি পরমার্থই আপনার অভিপ্রেত হয়, তবে রাজর্ষি জনকের তুল্য নির্লিপ্তচিত্তে প্রজাপালনে নিযুক্ত থেকে মোক্ষানুসন্ধান করুন।'

দশকরণ কিছুতেই সম্মত হলেন না। এদিকে তাঁর বনগমনের সংবাদ কিঞ্চিৎ রঞ্জিত হয়ে অন্তঃপুরে পোঁছে গেছে। ছোটরানী মহা উৎসাহে সভায় এসে বললেন, 'আর্যপুত্র, আমি প্রস্তুত, দ্বিপ্রহরের মধ্যেই সমস্ত গুছিয়ে ফেলব। সঙ্গে বেশী কিছু নেব না, শুধু আমার অলংকার তিন মঞ্জুষা, বসন দশ পেটিকা, এটা-সেটা বিশ পেটিকা। আর তিনজন সখী, আর দশজন দাসী, আর শুকসারী, আর আমার প্রিয় মার্জারী দধিমুখী। আপনি গোটাদশেক বড় বড় স্কন্ধাবার পাঠাবার ব্যবস্থা করুন, তাতেই আমাদের

ফুলিয়ে যাবে। উঃ, ভারী মজা হবে, দিনকতক ঝামেলা থেকে বাঁচা যাবে। সঙ্গে আবার ভেজাল জোটাবেন না যেন।'

রাজা বললেন, 'ওসব কিছুই যাবে না। যুবরাজ কাল তোমাকে পিত্রালয়ে পাঠিয়ে দেবেন।'

ছোটরানী রাগে দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে চলে গেলেন। বড়রানী দেবপূজায় ব্যস্ত ছিলেন, এখন সংবাদ পেয়ে এসে বললেন, 'মহারাজ, একি শুনছি! আমি সহধর্মিণী পট্টমহিষী, আমাকে ফেলে যাবেন না তো?'

রাজা উত্তর দিলেন, 'তুমি এখানেই তোমার পুত্রের কাছে থাকবে। আর ইচ্ছা হয় তো বারাণসীতে বাস করতে পার।'

যুক্তি, ধর্মোপদেশ, অনুনয়, ক্রন্দন কিছুতেই কিছু হ'ল না। রাজা দশকরণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সভা ভঙ্গ হ'ল।

দ্বিপ্রহরে দশকরণের নিভৃত কক্ষে গিয়ে রাজবয়স্য প্রগলভক বললেন, 'মহারাজ, এতকাল আমার কাছে কিছুই গোপন করেন নি। আজ একবার মনের কথাটি খুলে বলতে আজ্ঞা হ'ক। ধর্মে আপনার বেশী মতি আছে তা তো বোধ হয় না, পরকালের চিন্তাও কখনও করতে দেখি নি। পুত্রকলত্রের উপদ্রব সইতে না পেরে বনে পালাচ্ছেন না তো?'

রাজা বললেন, 'খেপেছ, তাহলে পুত্রকলত্রকেই বনে পাঠাতাম।'

'তবে কি জন্য যাচ্ছেন?

দশকরণ একটু হেসে বললেন, 'ফুর্তি করবার জন্য।'

'অবাক করলেন মহারাজ। রাজপদে থেকে ফুর্তি হবে না আর বনে গিয়ে হবে! ফুর্তি চান তো এখানেই তার বাধা কি? আরও গুটিদশেক মহিষী গৃহে আনুন, নৃত্যগীতনিপুণা ভাল ভাল বরাঙ্গনা বাহাল করুন, কাকাক্ষীনদীতটে সুবিশাল প্রমোদকানন রচনা করুন, তাতে মনোরম সৌধ তুলুন। উৎকলিঙ্গ থেকে নিপুণ সূপকার, গান্ধার থেকে পলান্নপাচক, গৌড়ভূমি থেকে লড্ডুকলাবিৎ আনান। আর মলয়াদ্রির গন্ধসম্ভার, সিংহলের রত্নাভরণ, বাহ্লিকজাত বিচিত্র আস্তরণ, যবনদেশের আসব —'

'থাম থাম, ওসব আমার খুব জানা আছে। শুধু বিলাস সামগ্রীতে কিছু হয় না, ভোগের শক্তি চাই।'

'আপনার শক্তির কমি কি? আর বনে গেলেই কি শক্তি বাড়বে?'

'মূর্খ, তুমি এখন বুঝবে না। যদি আবার কখনও দেখা হয়, তখন বুঝিয়ে দেব। যাও এখন বিরক্ত ক'রো না।

রাজাকে উন্মাদ ভেবে প্রগল্‌ভক বিষণ্ণ মনে চলে গেলেন।

দশকরণের বানপ্রস্থ

পরদিন ভোরবেলা দশকরণ রথারূঢ় হ'য়ে রাজ্য ত্যাগ করলেন। সঙ্গে নিলেন শুধু একটি নাতিবৃহৎ থলি। বহুদূরে এসে রথ আর সারথিকে ফিরিয়ে দিলেন, তার পর থলিটি কাঁধে নিয়ে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করলেন।

দশকরণ একটি গাছের তলায় ব'সে একান্তঃকরণে ব্রহ্মার আরাধনা করতে লাগলেন। তিন দিন তিন রাত অতিক্রান্ত হ'ল, অবশেষে ব্রহ্মা দর্শন দিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি চাও বৎস?'

দশকরণ সাষ্টাঙ্গপ্রণিপাতান্তে বললেন, 'প্রভু, আমার পিতৃদত্ত নামটি সার্থক করুন।'

'তার মানে?'

'আমার প্রত্যেক ইন্দ্রিয় দশগুণ ক'রে দিন। অর্থাৎ বিংশতি চক্ষু, বিংশতি কর্ণ, দশ নাসা, দশ জিহ্বা, দশগুণ বিস্তৃত ত্বক্।'

'আর বাক্-পাণি-পাদাদি কর্মেন্দ্রিয়? হৃৎ-ক্লোম-জঠরাদি যন্ত্র?'

'তাও দশ-দশগুণ।'

বিধাতা সবিস্ময়ে বললেন, 'অর্থাৎ তুমি একাই দশজন হ'তে চাও। তোমার মতলবটা কি?'

'প্রভু, তবে খুলে বলি শুনুন। আমার দেহটা তো মোটে সাড়ে তিন হাত বানিয়েছেন, আর ইন্দ্রিয়াদি যা

দিয়েছেন তাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র। কতই বা দেখব, কতই শুনব, কতই খাব, কতটুকুই বা ভোগ করব? আমি মহালোভী পুরুষ, আমার ইন্দ্রিয় বর্ধন ক'রে ভোগশক্তি দশগুণ বাড়িয়ে দিন।'

'বটে! কিন্তু দশ-দশটা আলাদা আলাদা দরকার কি, একটা প্রকাণ্ড দেহ যদি দিই, তাতে সব অঙ্গই তো বড় বড় হবে।'

'আজ্ঞে, আমি ভেবে দেখেছি, লাভ হবে না। হাতির দেহ প্রকাণ্ড, তার সুখভোগের মাত্রা তো ইঁদুরের চেয়ে বেশী নয়। সংখ্যা না বাড়লে ভোগ বাড়বে না।'

'তুমি খুব হিসাবী দেখছি। আচ্ছা, মন নামে একটা অন্তরিন্দ্রিয় আছে, তা কটা চাও?'

'সে কথা তো ভাবি নি প্রভু। আচ্ছা মন একটাই থাকুক।'

'উত্তম প্রস্তাব। এরূপ জীবকল্পনা আমার মাথাতেও আসে নি, তোমার উপরেই পরীক্ষা হ'ক। কিন্তু সামলাতে পারবে তো? যদি সর্দি হয় তো দশটা নাক হাঁচবে, যদি জ্বর হয় তবে বিশটা পা কামড়াবে। আরও অসুবিধা আছে —লোকে যদি রাক্ষস ভেবে তোমাকে আক্রমণ করে?'

'প্রভু, আপনি সুখ দুঃখ দুই-ই দিয়েছেন, তবু তো লোকে জীবন ধারণ করতে চায়। আমি দশটা জীবন এক-

সঙ্গে ভোগ করতে চাই, দুঃখ যদি বাড়ে সুখও তো বাড়বে। আমার এই বর্তমান দেহ খুব শক্তিমান, আর আপনার প্রদত্ত অঙ্গগুলির জন্য বলবীর্য দশগুণ বাড়বে। তবে যা দেবেন মজবুত দেখেই দেবেন। আমার সঙ্গে প্রচুর ধনরত্নও আছে, সেই অর্থবলে আর বাহুবলে সকলকেই বশে এনে নবরাজ্য স্থাপন করব।'

বিধাতা বললেন, 'তবে তাই হ'ক, তথাস্তু। সার্থকনামা দশকরণ, উত্তিষ্ঠ, ঐ ডোবার জলে তোমার নবকলেবরের প্রতিবিম্ব দেখে নাও, তারপর যথেচ্ছা ভোগের আয়োজন কর।'

এক বৎসর হয়ে গেছে। ব্রহ্মা বেদের পুঁথি নিয়ে কাটাকুটি করছেন এমন সময় তাঁর চতুর্মুণ্ডের চতুঃশিখা থরথর ক'রে কেঁপে উঠল, যাকে বলে টনক নড়া। ধ্যানস্থ হয়ে বুঝলেন দশকরণ তাঁকে আবার ডাকছেন। অদ্ভুত-দেহধারীর পরিণাম জানবার জন্য তাঁর কৌতূহল হ'ল, আহ্বান পাবামাত্র ভূলোকে অবতরণ করলেন।

দশকরণ সেই গাছটির তলায় বিষণ্ণ হয়ে বসে আছেন। বিধাতাকে দেখে ধড়মড়িয়ে উঠে দণ্ডবৎ হলেন—কিছু কষ্টে, কারণ তাঁর নূতন যৌগিক দেহটি লম্বায় না বাড়লেও বেষ্টনে অনেকখানি।

ব্রহ্মা বললেন, 'ভাল তো সব ?'

'কিছুই ভাল নয় প্রভু। বর তো দিলেন, কিন্তু সুখ পাচ্ছি না। আগে দুই চোখে একই দৃশ্য দেখতাম, এখন কুড়ি চোখে নানাদিকের দৃশ্য মিশে গিয়ে একাকার হয়ে যাচ্ছে-- গাছের উপর জল, জলের মধ্যে উড়ন্ত পাখি। ভেবেছিলাম দশ রসনায় বিভিন্ন রসের আস্বাদ নিয়ে এক সঙ্গে বিচিত্র অনুভূতি পাব, এখন দেখছি কটুতিক্তমধুর মিশে গিয়ে এক উৎকট উপলব্ধি হচ্ছে। দশটি উদর বোঝাই ক'রেও তৃপ্তি বাড়ছে না। দশ জোড়া পা থাকলেও দশগুণ পথ চলতে পারি না। সব অঙ্গেরই এই দশা। আচ্ছা, আপনিও তো চতুরানন চতুর্ভুজ, কিরকম বোধ করেন ?'

'কিছুই বোধ করি না, ওসব মাথামুণ্ড আমার নিজের নয়। মানুষ সৃষ্টি করবার পর হঠাৎ একদিন দেখি আমার চারটে মাথা চারটে হাত গজিয়েছে। এ হচ্ছে মানুষের কাজ, তারা আমার সৃষ্টির শোধ তুলেছে আমারই স্কন্ধে। তা এখন কি চাও বল।'

'আপনিই বলুন কি করলে আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।'

'বাপু, পরামর্শ দেওয়া আমার কাজ নয়। আর তোমার উদ্দেশ্য যে কি তারও স্পষ্ট ধারণা তোমার নেই। যা চাও নিজেই স্থির ক'রে বল।'

'আমার একটা মনই গোলযোগের কারণ। এখন কৃপা

ক'রে দশটি মন দিন, তাতে প্রত্যক্ষগুলো আর জট পাকাবে না, আলাদা আলাদা মনের খোপে খোপে থাকবে।'

ব্রহ্মা তথাস্তু ব'লে প্রস্থান করলেন।

আর এক বৎসর কেটে গেছে। ব্রহ্মার আবার টনক নড়ল, দশকরণ ডাকছেন। বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আঃ লোকটা জ্বালিয়ে মারলে। যাই হ'ক, শেষ অবধি দেখতে হবে।'

ব্রহ্মা এসে দশকরণকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিহে, এবার সুবিধে হ'ল ?'

দশকরণ কাতরকণ্ঠে বললেন, 'কই আর হ'ল প্রভু, দশটা মনে আরও গোলযোগ বেড়েছে। যতই চেষ্টা করি মনে হয় ভিন্ন ভিন্ন লোক ভোগ করছে। একবার বোধ হয় আমি দেবদত্ত—মিষ্টান্ন খাচ্ছি, আবার ভাবি আমি গঙ্গদত্ত—সংগীত শুনছি। তখনই আবার দেখি আমি অনঙ্গদত্ত—প্রেমালাপে মগ্ন, পুনশ্চ আমি ত্রিভঙ্গদত্ত—গেঁটেবাতে কাতর। সমস্ত অনুভূতি কেন্দ্রস্থ করতে পারছি না, কেবলই বিক্ষেপ হয়। আমার মনগুলোও দিয়েছেন হরেক রকমের—চালাক, বোকা, শান্ত, সহিষ্ণু, রাগী, উদার, হিংসুটে, নিষ্ঠুর, দয়ালু। এই দেখুন না, আপনার কাছে

যে মনের কথা জানাব তাতেও বাধা। প্রত্যেক মন চায়—আমি বলব, আমি বলব। কোনও গতিকে রফা ক'রে একটি মন এখন মুখপাত্র হয়েছে।'

'হুঁ, এ রকম যে হবে তা আগেই অনুমান করেছিলাম। এখন কি চাও?'

'প্রভু, কিছুই বুঝতে পারছি না, আপনিও তো উপায় বলবেন না। এখন বরং পূর্বদেহ পূর্বমন ফিরে দিন, দিন-কতক প্রকৃতিস্থ হ'য়ে ভেবে চিন্তে দেখি, তারপর আবার আপনার শরণাপন্ন হব।'

ব্রহ্মা বললেন, 'তথাস্তু।'

তার পর আরও পাঁচ বৎসর কেটে গেছে। ব্রহ্মা দশকরণের কথা ভুলে গেছেন, তাঁর কাছে কোন ডাকও আর আসে নি। একদিন তিনি সৃষ্টিচিন্তা করছেন, ভাবছেন—বেঁটে শরীরের সঙ্গে পীতচর্ম আর খাঁদা নাক দিলে কেমন হয়, এমন সময় তাঁর তৃতীয় মুণ্ডের দ্বিতীয় কর্ণ সুড়সুড় ক'রে উঠল। হাত দিয়ে পেলেন—একটি ষট্পদ সহস্রাক্ষ বিচিত্রপক্ষ পতঙ্গ, যার নাম প্রজাপতি। দেখেই দশকরণকে মনে পড়ে গেল।

লোকটার হ'ল কি, আর তো সাড়াশব্দ নেই, মারা গেল নাকি? বোধ হয় হতাশ হ'য়ে নিজের রাজ্যে ফিরে

গেছে। কিন্তু গিয়েই বা কি করবে, এই সাত বৎসর পরে তার ছেলে তো আর দখল দেবে না। ধ্যানস্থ হ'য়ে দেখলেন, দশকরণ বেঁচে আছেন, দর্ভাবতীর নিকটেই ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বিধাতা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের মূর্তিতে তখনই সেখানে নেমে এলেন।

গোপপল্লী। একটা মেটে ঘরের মটকায় চ'ড়ে দশকরণ খড় দিয়ে চাল ছাইছেন, ঘরের সামনে একটি গোপনারী. শিশুকে খাওয়াচ্ছে আর হাত নেড়ে দশকরণকে কাজ বাতলাচ্ছে।

ব্রহ্মা ডাকলেন, 'ওহে দশকরণ, হচ্ছে কি?'

দশকরণ নেমে এসে অপরিচিত ব্রাহ্মণকে প্রণাম ক'রে বললেন, 'কে আপনি দ্বিজবর?'

'আরে আমি ব্রহ্মা, তোমার খোঁজ নিতে এসেছি। তার পর তোমার গবেষণা কতদূর এগল? চেহারাটা চাষাড়ে হয়ে গেছে দেখছি। এখন করা হয় কি, আছ কেমন?'

'খুব ভাল আছি প্রভু। এই গৃহের স্বামী অসুস্থ, অন্য পুরুষ নেই, বর্ষাও আসন্ন, তাই আমিই ঘরের চালটা মেরামত ক'রে দিচ্ছি।'

'সুখ হচ্ছে?'

'পরিশ্রম হচ্ছে, অভ্যাস নেই কিনা। সুখী হবে এই গোপদম্পতি।'

'এখানেই থাকা হয় বুঝি?'

'না, গ্রামের প্রান্তে থাকি, তবে কাজের জন্য নানা স্থানে ঘুরে বেড়াতে হয়।'

'দর্ভাবতী রাজ্যের সংবাদ কি, তোমার সেই ধনরত্নের থলিটার কি হ'ল?'

'রাজ্য পুত্রের হাতে, আর ধন যা এনেছিলাম তার কিছু খরচ হয়ে গেছে, অবশিষ্ট রাজকোষে ফেরত দিয়েছি। রাজ্যের লোকে এখন আমাকে চিনতে পারে না, আর দুরভিসন্ধি নেই জেনে কেউ অনিষ্টও করে না।'

'রাজমহিষীরা কোথায়?'

'জ্যেষ্ঠা পত্নী আমার কাছেই আছেন। কনিষ্ঠা আসতে চান না।'

'তা হ'লে আবার সংসারধর্ম করছ। আমি ভেবেছিলাম বুঝি বানপ্রস্থের অন্তে সন্ন্যাস নিয়েছ। তোমার সেই উৎকট খেয়ালের কি হ'ল—সেই মহাভোগায়তন দশদেহসংঘাত?'

দশকরণ সহাস্যে বললেন, 'সে সমস্যার সমাধান হ'য়ে গেছে প্রভু। এখন আমি দশকরণ নই, কোটিকরণ; তারও একীকরণ হয়ে গেছে। গোছাবাঁধা দশটা দেহমনের দরকার কি, দেখছি যত জীব আছে সব মিলে আমি, এখন ভোগের ইয়ত্তা নেই। ভারী সুবিধা হয়েছে, সকলের সুখদুঃখ পৃথক্ ক'রেও বুঝতে পারি, একত্রও বুঝতে পারি।'

'কি রকম ?'

'সেদিন বাঘে একটা গরু মারলে। অবলা গরুর মৃত্যুযন্ত্রণা আর ক্ষুধার্ত বাঘের ভোজনসুখ দুই-ই বুঝলাম। গ্রামের লোকে মিলে কুঠারাঘাতে বাঘটা মারলে। অসহায় বাঘের আর্তনাদ আর দলবদ্ধ গ্রামবাসীর উল্লাস তাও বুঝলাম।'

'ভাল মন্দ সবই তুমি নির্বিকার সাক্ষী হ'য়ে দেখ ?'

'তা কেন দেখব। বাঘটাকে প্রথম মার আমিই দিয়েছিলাম, মৃগয়া অভ্যাস ছিল কি না। আপনি অপক্ষপাতে ভাল মন্দ মিশিয়ে জগৎ সৃষ্টি করেছেন, আবার প্রবল স্বার্থবোধও দিয়েছেন। তাই বাঘে গরুমানুষ মারে, মানুষে বাঘ মারে, মানুষকেও মারে। যখন রাজা ছিলাম, তখন নিজের সুখটাই অগ্রগণ্য ছিল। তার পর সুখবৃদ্ধির নূতন উপায় মাথায় এল, আপনার বরে দশকায় দশমনা হলাম। নিজের দশটা অংশের স্বার্থসিদ্ধি তো সব সময় করা যায় না, তাই রফা করতে হ'ল। যথাসম্ভব সবকটাকে সুখে রাখবার চেষ্টা করতাম, না পারলে গোটাকতককে নিগৃহীত করতাম। তার পর স্বার্থবুদ্ধি আরও ব্যাপক হ'ল, বুঝলাম দশটা দেহমন যথেষ্ট নয়, একসঙ্গে জড়িয়ে থাকাও অনর্থকর, পৃথক্ থেকেও একত্ববোধ হয়। এখন কোটিকরণ হয়েছি, বিস্তর ইন্দ্রিয়, বিস্তর দেহমন। তাই মধ্যম পন্থা

আরও বেশী শিখেছি। সর্ব অবয়বের লাভালাভ বুঝে চলতে হয় প্রভু, আপনার মতন নির্মম সাক্ষী হয়ে থাকতে পারি না।'

'লাভালাভ বিচারে ভুল কর না?'

'করি বই কি। সেটা আপনার দোষে—যেমন বুদ্ধি দিয়েছেন তেমনই তো হবে, ঘ'সে মেজে ঠেকে শিখে আর কতই বাড়বে।'

'আচ্ছা দশকরণ, বুঝলাম তোমার অনেক দেহ, অনেক মন। কিন্তু তোমার আত্মা কটা?'

'সমস্যায় ফেললেন প্রভু। বৃদ্ধ মাণ্ডুক বলতেন বটে —জীবাত্মা, পরমাত্মা, প্রত্যগাত্মা, সর্বভূতান্তরাত্মা—এইসব কটমটে কথা। আমার কটা আছে তা তো জানি না।'

'হয়তো এককালে জানবে। না জানলেও তোমার কাজ আটকাবে না।'

এমন সময় একটি লোক এসে ডাকলে, 'ওহে এককড়ি, আজ যে বুড়ো জরৎখরের কুলত্যাগিনী বউটার একটা গতি করবার কথা, তার পর গ্রামের ছেলেদের ধনুর্বিদ্যা শেখাবে, তার পর সন্ধ্যায় ভরতরাজার উপাখ্যান শোনাবে বলেছিলে। তোমার আর কত দেরি?'

ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করলেন, 'এককড়ি কে?'

দশকরণ বললেন, 'আজ্ঞে আমি। ওরা কোটিকরণ

একীকরণ বোঝে না, সংক্ষেপে এককড়ি বলে। তুমি এগোও হে, আমি হাতের কাজটা শেষ ক'রেই যাচ্ছি। প্রভু, আমার একটি শেষ প্রার্থনা আছে। বয়স তো অনেক হ'ল, গবেষণাও ঢের ক'রে দেখলাম। এইবার মুক্তির সন্ধান দিন।'

ব্রহ্মা হেসে বললেন, 'বল কি হে, তোমার এতগুলো সত্তাকে ফাঁকি দিয়ে তুমি একাই মুক্তি চাও?

'ঠিক বলেছেন। থাক গে, মুক্তির দরকার নেই।'

'দরকার না থাকলেও তুমি পেয়ে গেছ।'

'দোহাই পিতামহ, পরিহাস করবেন না।'

'আরে মুক্তির পথ কি একটা? তোমার রাজবুদ্ধি তোমাকে মুক্তির রাজমার্গ দেখিয়েছে।'

বিধাতা অন্তর্হিত হলেন। দশকরণ আবার মটকায় চ'ড়ে ভাবতে লাগলেন—এ কিরকম মুক্তি, লোকে ছাড়তেই চায় না, নাইবার খাবার অবসর নেই।

১৩৪৯

তৃতীয়দ্যূতসভা

মহাভারতে আছে, প্রথম দ্যূতসভায় যুধিষ্ঠির সর্বস্ব হেরে যাবার পর ধৃতরাষ্ট্র অনুতপ্ত হ'য়ে তাঁকে সমস্ত পণ ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। পাণ্ডবরা যখন ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে যাচ্ছিলেন তখন দুর্যোধনের প্ররোচনায় ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে আবার খেলবার জন্য ডেকে আনান। এই দ্বিতীয় দ্যূত-সভাতেও যুধিষ্ঠির হেরে যান এবং তার ফলে পাণ্ডবদের নির্বাসন হয়।

শকুনি-যুধিষ্ঠির কিরকম পাশা খেলেছিলেন? তাঁদেব খেলায় ছক আর ঘুঁটি ছিল না, উভয় পক্ষ পণ উচ্চারণ ক'রেই অক্ষপাত করতেন, যাঁর দান বেশী পড়ত তাঁরই জয়। মহাভারতে দ্যূতপর্বাধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরের প্রত্যেকবার পণ ঘোষণার পর এই শ্লোকটি আছে—

এতচ্ছ্রুত্বা ব্যবসিতো নিকৃতিং সমুপাশ্রিতঃ।
জিতমিত্যেব শকুনির্যুধিষ্ঠিরমভাষত॥

অর্থাৎ পণঘোষণা শুনেই শকুনি নিকৃতি (শঠতা) আশ্রয় ক'রে খেলায় প্রবৃত্ত হলেন এবং যুধিষ্ঠিরকে বললেন—জিতলাম। এতে বোঝা যায় যে পাশা ফেলবার সঙ্গে সঙ্গে এক-একটা বাজি শেষ হ'ত।

তৃতীয়দ্যূতসভা

অনেকেই জানেন না যে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের কিছুদিন পূর্বে যুধিষ্ঠির আরও একবার শকুনির সঙ্গে পাশা খেলেছিলেন। ব্যাসদেব মহাভারত থেকে তৃতীয়দ্যূতপর্বাধ্যায়টি কেন বাদ দিয়েছেন তা বলা শক্ত। হয়তো কোনও রাজনীতিক কারণ ছিল, কিংবা তিনি ভেবেছিলেন যে আসন্ন কলিকালে কুটিল দ্যূতপদ্ধতির রহস্যপ্রকাশ জনসাধারণের পক্ষে অনিষ্টকর হবে। বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে প্রতারণার যেসব উপায় উদ্ভাবিত হয়েছে তার তুলনায় শকুনি-যুধিষ্ঠিরের পাশাখেলা ছেলেখেলা মাত্র, সুতরাং এখন সেই প্রাচীন রহস্য প্রকাশ করলে বেশী কিছু অনিষ্ট হবে না।

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পঁচিশ দিন পূর্বের কথা। যুধিষ্ঠির সকাল বেলা তাঁর শিবিরে ব'সে আছেন, সহদেব তাঁকে সংগৃহীত রসদের ফর্দ প'ড়ে শোনাচ্ছেন। অর্জুন পাঞ্চালশিবিরে মন্ত্রণাসভায় গেছেন, নকুল সৈন্যদের কুচকাওয়াজে ব্যস্ত। ভীম যে এক শ গদা ফরমাস দিয়েছিলেন তা পৌঁছে গেছে, এখন তিনি প্রত্যেকটি আস্ফালন ক'রে এক এক জন ধার্তরাষ্ট্রের নামে উৎসর্গ করছেন। সব গদা শাল কাঠের, কেবল একটি কাপড়ের খোলে তুলো ভরা। এটি দুর্যোধনের ১৮নং ভ্রাতা বিকর্ণের জন্য। ছোকরার

মতিগতি ভাল, দ্রৌপদীর ধর্ষণের সময় সে প্রবল প্রতিবাদ করেছিল।

সহদেব পড়ছিলেন, 'যবশক্তু দ্বাদশ মন, চণকচূর্ণ অষ্ট লক্ষ মন, অভগ্ন চণক পঞ্চাশ লক্ষ মন—'

ফর্দ শুনে শুনে যুধিষ্ঠিরের বিরক্তি ধরেছিল। কিছু আগ্রহ প্রকাশ না করলে ভাল দেখায় না, সেজন্য প্রশ্ন করলেন, 'ওতেই কুলিয়ে যাবে?'

সহদেব বললেন, 'খুব। মোটে তো সাত অক্ষৌহিণী, আর যুদ্ধ শেষ হ'তে বড় জোড় দিন-কুড়ি, প্রতিদিন মরবেও বিস্তর। তার পর শুনুন—ঘৃত লক্ষ কুম্ভ-'

'তুমি আমাকে পথে বসাবে দেখছি। অত অর্থ কোথায় পাব?'

'অর্থের প্রয়োজন কি, সমস্তই ধারে কিনেছি, জয়-লাভের পর মিষ্টবাক্যে শোধ করবেন। তৈল দ্বিলক্ষ কুম্ভ, লবণ অর্ধ লক্ষ মন—'

'থাক থাক। যা ব্যবস্থা করবার ক'রে ফেল বাপু, আমাকে ভোগাও কেন। আমি রাজধর্ম বুঝি, নীতিশাস্ত্র বুঝি। অঙ্ক কষা বৈশ্যের কাজ, আমার মাথায় ওসব ঢোকে না।'

এমন সময় প্রতিহার এসে জানালে, 'ধর্মরাজ, এক অভিজাতকল্প কুব্জপুরুষ আপনার দর্শনপ্রার্থী। পরিচয়

দিলেন না ; বললেন, তাঁর বার্তা অতি গোপনীয়, সাক্ষাতে নিবেদন করবেন।'

সহদেব বললেন, 'মহারাজ এখন রাজকার্যে ব্যস্ত, ওবেলা আসতে বল।'

সহদেবের হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্য যুধিষ্ঠির ব্যগ্র হয়েছিলেন। বললেন, 'না না, এখনই তাঁকে নিয়ে এস।'

আগন্তুক বক্রপৃষ্ঠ প্রৌঢ়, বলিকুঞ্চিত শীর্ণ মুণ্ডিত মুখ, মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ি, গলায় নীলবর্ণ রত্নহার, পরনে ঢিলে ইজের, তার উপর লম্বা জামা। যুক্তকর কপালে ঠেকিয়ে বললেন, 'ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের জয়।'

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে আপনি সৌম্য?'

আগন্তুক উত্তর দিলেন, 'মহারাজ, ধৃষ্টতা ক্ষমা করবেন, আমার বক্তব্য কেবল রাজকর্ণে নিবেদন করতে চাই।'

যুধিষ্ঠির বললেন, 'সহদেব, তুমি এখন যেতে পার। ছোলার বস্তাগুলো খুলে দেখ গে, পোকাধরা না হয়।' সহদেব বিরক্ত হ'য়ে সন্দিগ্ধ মনে চ'লে গেলেন।

আগন্তুক অনুচ্চস্বরে বললেন, 'মহারাজ, আমি সুবল-পুত্র মৎকুনি, শকুনির বৈমাত্র ভ্রাতা।'

'বলেন কি, আপনি আমাদের পূজনীয় মাতুল, প্রণাম প্রণাম—কি সৌভাগ্য—এই সিংহাসনে বসতে আজ্ঞা হ'ক।'

'না মহারাজ, এই নিম্ন আসনই আমার উপযুক্ত। আমি দাসীপুত্র, আপনার সংবর্ধনার অযোগ্য।'

'আচ্ছা আচ্ছা, তবে ঐ শৃগালচর্মাবৃত বেদীতে উপবেশন করুন। এখন কৃপা ক'রে বলুন কি প্রয়োজনে আগমন হয়েছে। মাতুল, আগে তো কখনও আপনাকে দেখি নি।'

'দেখবেন কি ক'রে মহারাজ। আমি অন্তরালেই বাস করি, তা ছাড়া গত তের বৎসর বিদেশে ছিলাম। কুব্জতার জন্য ক্ষত্রিয়ধর্ম পালন আমার সাধ্য নয়, সে কারণে যন্ত্রমন্ত্র-বিদ্যার চর্চা ক'রে তাতেই সিদ্ধিলাভ করেছি। দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা আমাকে বরদানে কৃতার্থ করেছেন। পাণ্ডবরাজ, শুনেছি দ্যূতক্রীড়ায় আপনার পটুতা অসামান্য, অক্ষহৃদয় আপনার নখদর্পণে।'

'হুঁ, লোকে তাই বলে বটে।'

'তথাপি শকুনির হাতে আপনার পরাজয় ঘটেছে। কেন জানেন কি?'

যুধিষ্ঠির ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে বললেন, 'শকুনি ধর্মবিরুদ্ধ কপট দ্যূতে আমাকে হারিয়েছিলেন।'

মৎকুনি একটু হেসে বললেন, 'দ্যূতে কপট আর অকপট ব'লে কোনও ভেদ নেই। যে অক্ষক্রীড়ায় দৈবই উভয় পক্ষের অবলম্বন, অজ্ঞ লোকে তাকে অকপট বলে।

যদি এক পক্ষ দৈবের উপর নির্ভর করে এবং অপর পক্ষ পুরুষকার দ্বারা জয়লাভ করে, তবে পরাজিত পক্ষ কপটতার অভিযোগ আনে। ধর্মরাজ, আপনার দৈবপাতিত অক্ষ শকুনির পুরুষকারপাতিত অক্ষের নিকট পরাস্ত হয়েছে। আপনি প্রবলতর পুরুষকার আশ্রয় করুন, রাবণবাণের বিরুদ্ধে রামবাণ প্রয়োগ করুন, দ্যূতলক্ষ্মী আপনাকেই বরণ করবেন।'

'মাতুল, আপনার বাক্য আমার ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না। লোকে বলে শকুনির অক্ষের অভ্যন্তরে এক পার্শ্বে স্বর্ণপট্ট নিবদ্ধ আছে, তারই ভারে সেই পার্শ্ব সর্বদা নিম্নবর্তী হয় এবং উপরে গরিষ্ঠ বিন্দুসংখ্যা প্রকাশ করে।'

'মহারাজ, লোকে কিছুই জানে না। স্বর্ণগর্ভ বা পারদগর্ভ পাশক নিয়ে অনেকে খেলে বটে, কিন্তু তার পতন সুনিশ্চিত নয়, বহুবারের মধ্যে কয়েকবার ভ্রংশ হ'তেই হবে। আপনারা তো অনেক বাজি খেলেছিলেন, একবারও কি আপনার জিত হয়েছিল?'

যুধিষ্ঠির দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'একবারও নয়।'

'তবে? শকুনি কাঁচা খেলোয়াড় নন, তিনি অব্যর্থ পাশক না নিয়ে কখনই আপনার সঙ্গে খেলতেন না।'

'কিন্তু এখন এসব কথার প্রয়োজন কি। যুদ্ধ আসন্ন, পুনর্বার দ্যূতক্রীড়ার সম্ভাবনা নেই, শকুনিকে হারাবার সামর্থ্যও আমার নেই।'

'ধর্মপুত্র, নিরাশ হবেন না, আমার গূঢ় কথা এইবারে শুনুন। শকুনির অক্ষ আমারই নির্মিত, তার গর্ভে আমি মন্ত্রসিদ্ধ যন্ত্র স্থাপন করেছি, সেজন্য তার ক্ষেপ অব্যর্থ। দুরাত্মা শকুনি যন্ত্রকৌশল শিখে নিয়ে আমাকে গজভুক্ত-কপিত্থবৎ পরিত্যাগ করেছে। সে আমাকে আশ্বাস দিয়েছিল যে পাণ্ডবগণের নির্বাসনের পর দুর্যোধন আমাকে ইন্দ্রপ্রস্থের রাজপদ দেবে। আপনারা বনে গেলে যখন দুর্যোধনকে প্রতিশ্রুতির কথা জানালাম, তখন সে বললে — আমি কিছুই জানি না, মামাকে বল। শকুনি বললে — আমি কি জানি, দুর্যোধনের কাছে যাও। অবশেষে দুই নরাধম আমাকে ছলে বলে দুর্গম বাহ্লীক দেশে পাঠিয়ে সেখানে কারারুদ্ধ ক'রে রাখে। আমি তের বৎসর পরে কোনও গতিকে সেখান থেকে পালিয়ে এসে আপনার শরণাপন্ন হয়েছি।'

যুধিষ্ঠির বললেন, 'ও, এখন বুঝি আমাকেই অক্ষরূপে চালনা ক'রে রাজ্যলাভ করতে চান!'

'ধর্মরাজ, আমার পূর্বাপরাধ মার্জনা করুন, যা হবার তা হ'য়ে গেছে, এখন আমাকে আপনার পরম হিতাকাঙ্ক্ষী ব'লে জানবেন। আমি বামন হ'য়ে ইন্দ্রপ্রস্থরূপ চন্দ্রে হস্ত-প্রসার করেছিলাম, তাই আমার এই দুর্দশা। আপনি বিজয়ী হ'য়ে শকুনিকে বিতাড়িত করে আমাকে গান্ধাররাজ্য দেবেন, তাতেই আমি সন্তুষ্ট হব।'

'আপনার নির্মিত অক্ষে আমার সর্বনাশ হয়েছে তারই পুরস্কারস্বরূপ?'

মৎকুনি জিহ্বা দংশন ক'রে বললেন, 'ও কথা আর তুলবেন না মহারাজ। আমার বক্তব্য সবটা শুনুন। আমি গুপ্ত সংবাদ পেয়েছি—সঞ্জয় এখনই ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞায় আপনার কাছে আসছেন। দুর্যোধন আর শকুনির প্ররোচনায় অন্ধ রাজা আবার আপনাকে দ্যূতক্রীড়ায় আহ্বান করছেন। মহারাজ, এই মহা সুযোগ ছাড়বেন না।'

এমন সময় রথের ঘর্ঘর ধ্বনি শোনা গেল। মৎকুনি ত্রস্ত হ'য়ে বললেন, 'ঐ সঞ্জয় এসে পড়লেন। দোহাই মহারাজ, ধৃতরাষ্ট্রের প্রস্তাব সদ্য সদ্য প্রত্যাখ্যান করবেন না, বলবেন যে আপনি বিবেচনা ক'রে পরে উত্তর পাঠাবেন। সঞ্জয় চ'লে গেলে আমার সব কথা আপনাকে জানাব। আমি আপাতত ঐ পাশের ঘরে লুকিয়ে থাকছি।'

যথাবিধি কুশলপ্রশ্নাদি বিনিময়ের পর সঞ্জয় বললেন, 'পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ, কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকেই আপনার কাছে পাঠাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বিদুর এই অপ্রিয় কার্যে কিছুতেই সম্মত না হওয়ায় রাজাজ্ঞায় আমাকেই আসতে হয়েছে। আমি দূত মাত্র, আমার অপরাধ নেবেন না।'

ধৃতরাষ্ট্র এই বলেছেন — বৎস যুধিষ্ঠির, তোমরা পঞ্চ ভ্রাতা আমার শত পুত্রের সমান স্নেহপাত্র। এই লোকক্ষয়কর জ্ঞাতিধ্বংসী আসন্ন যুদ্ধ যেকোনও উপায় নিবারণ করা কর্তব্য। আমি অশক্ত অন্ধ বৃদ্ধ, আমার পুত্রেরা অবাধ্য এবং যুদ্ধের জন্য উৎসুক। আমি বহু চিন্তা ক'রে স্থির করেছি যে হিংস্র অস্ত্রযুদ্ধের পরিবর্তে অহিংস দ্যূতযুদ্ধেই উভয় পক্ষের বৈরভাব চরিতার্থ হ'তে পারে। অতি কষ্টে আমার পুত্রগণ ও তাদের মিত্রগণকে এতে সম্মত করেছি। অতএব তুমি সবান্ধবে কৌরবশিবিরে এসে আর একবার সুহৃদ্দ্যূতে প্রবৃত্ত হও। পণ পূর্ববৎ সমগ্র কুরুপাণ্ডব-রাজ্য। যদি দুর্যোধনের প্রতিনিধি শকুনির পরাজয় ঘটে তবে কুরুপক্ষ সদলে রাজ্য ত্যাগ ক'রে চিরতরে বনবাসে যাবে। যদি তুমি পরাস্ত হও তবে তোমরাও রাজ্যের আশা ত্যাগ ক'রে চিরবনবাসী হবে। বৎস, তুমি কপটতার আশঙ্কা ক'রো না। আমি দুই প্রস্থ অক্ষ সজ্জিত রাখব, তুমি স্বহস্তে নিজের জন্য বেছে নিও, অবশিষ্ট অক্ষ শকুনি নেবেন। এর চেয়ে অসন্দিগ্ধ ব্যবস্থা আর কি হ'তে পারে? সঞ্জয়ের মুখে তোমার সম্মতি পাবার আশায় উদ্গ্রীব হয়ে রইলাম। হে তাত যুধিষ্ঠির, তোমার সুমতি হ'ক, তোমাদের পঞ্চ ভ্রাতার কল্যাণ হ'ক, অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সহ কুরু-পাণ্ডবের প্রাণ রক্ষা হ'ক।'

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন, 'জ্যেষ্ঠতাত কি স্বয়ং এই বাণী রচনা করেছেন? আমার মনে হয় তাঁর মন্ত্রদাতা দুর্যোধন আর শকুনি, বৃদ্ধ কুরুরাজ শুধু শুকপক্ষিবৎ আবৃত্তি করেছেন। মহামতি সঞ্জয়, আপনি আমাকে কি করতে বলেন?'

'ধর্মপুত্র, আমি কুরুরাজের আজ্ঞাপিত বার্তাবহ মাত্র, নিজের মত জানাবার অধিকার আমার নেই। আপনি রাজ-বুদ্ধি ও ধর্মবুদ্ধি আশ্রয় করুন, আপনার মঙ্গল হবে।'

'তবে আপনি কুরুরাজকে জানাবেন যে তিনি আমাকে অতি দুরূহ সমস্যায় ফেলেছেন, আমি সম্যক্ বিবেচনা ক'রে পরে তাঁকে উত্তর পাঠাব। এখন আপনি বিশ্রামান্তে আহারাদি করুন, কাল ফিরে যাবেন।'

'না মহারাজ, আমাকে এখনই ফিরতে হবে, বিশ্রামের অবসর নেই। ধর্মপুত্রের জয় হ'ক। এই ব'লে সঞ্জয় বিদায় নিলেন।

শকুনি পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললেন 'মহারাজ, আপনি ঠিক উত্তর দিয়েছেন। এইবার আমার মন্ত্রণা শুনুন। আজই অপরাহ্নে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে একজন বিশ্বস্ত দূত পাঠান, কিন্তু আপনার ভ্রাতারা যেন জানতে না পারেন। আপনার দূত গিয়ে বলবে—হে

পূজ্যপাদ জ্যেষ্ঠতাত, আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য, অতি অপ্রিয় হ'লেও তৃতীয়বার দ্যূতক্রীড়ায় আমি সম্মত আছি। আপনার আয়োজিত অক্ষে আমার প্রয়োজন নেই, আমি নিজের অক্ষেই নির্ভর করব। শকুনিও নিজের অক্ষে খেলবেন। আপনি যে পণ নির্ধারণ করছেন তাতেও আমার সম্মতি আছে। শুধু এই নিয়মটি আপনাকে মেনে নিতে হবে যে শকুনি আর আমি প্রত্যেকে একটিমাত্র অক্ষ নিয়ে খেলব এবং তিনবার মাত্র অক্ষক্ষেপণ করব, তাতে যার বিন্দুসমষ্টি অধিক হবে তারই জয়।'

যুধিষ্ঠির বললেন, 'হে সুবলনন্দন মৎকুনি, আপনি সম্পর্কে আমার মাতুল হন, কিন্তু এখন বোধ হচ্ছে আপনি বাতুল। আমি কোন্ ভরসায় আবার শকুনির সঙ্গে স্পর্ধা করব? যদি আপনি আমাকে শকুনির অনুরূপ অক্ষ প্রদান করেন তাতে সমানে সমানে প্রতিযোগ হবে, কিন্তু আমার জয়ের স্থিরতা কোথায়? দৃতরাষ্ট্রের আয়োজিত অক্ষে আপত্তির কারণ কি? আমার ভ্রাতাদের মত না নিয়েই বা কেন এই দ্যূতক্রীড়ায় সম্মতি দেব? তিনবার মাত্র অক্ষ ক্ষেপণের উদ্দেশ্য কি? বহুবার ক্ষেপণেই তো সংখ্যাবৃদ্ধির সম্ভাবনা অধিক। আর আপনি যে দুর্যোধনের চর নন তারই বা প্রমাণ কি?'

মৎকুনি বললেন, 'মহারাজ, স্থিরোভব, আপনার সমস্ত

সংশয় আমি ছেদন করছি। যদি আপনি ধৃতরাষ্ট্রের আয়োজিত অক্ষ নিয়ে খেলেন তবে আপনার পরাজয় অনিবার্য। ধূর্ত শকুনি সে অক্ষে খেলবে না, হাতে নিয়ে ইন্দ্রজালিকের ন্যায় বদলে ফেলে নিজের আগেকার অক্ষেই খেলবে। আমি এতকাল বাহ্লীক দুর্গে নিশ্চেষ্ট ছিলাম না, নিরন্তর গবেষণায় প্রচণ্ডতর মন্ত্রশক্তিযুক্ত অক্ষ উদ্‌ভাবন করেছি। আপনাকে এই নবযন্ত্রান্বিত আশ্চর্য অক্ষ দেব, তার কাছে এলেই শকুনির পুরাতন অক্ষ একেবারে বিকল হয়ে যাবে। মহারাজ, আপনার জয়ে কিছুমাত্র সংশয় নেই। আপনার ভ্রাতারা যুদ্ধলোলুপ, আপনার তুল্য স্থিরবুদ্ধি দূরদর্শী নন। তাঁরা আপনাকে বাধা দেবেন, ফলে এই রক্তপাতহীন বিজয়ের মহা সুযোগ আপনি হারাবেন। আপনি আগে ধৃতরাষ্ট্রকে সংবাদ পাঠান, তার পর আপনার ভ্রাতাদের জানাবেন। তাঁরা ভর্ৎসনা করলে আপনি হিমালয়বৎ নিশ্চল থাকবেন।'

'কিন্তু দ্রৌপদী? মাতুল, আপনি তাঁর কটুবাক্য শোনেন নি।'

'মহারাজ, স্ত্রীজাতির ক্রোধ তৃণাগ্নিতুল্য, তাতে পর্বত বিদীর্ণ হয় না। কদিনেরই বা ব্যাপার, আপনার জয়লাভ হ'লে সকল নিন্দকের মুখ বন্ধ হবে। তারপর শুনুন— আমার যন্ত্র অতি সূক্ষ্ম, সেজন্য এক দিনে অধিকবার অক্ষ-

ক্ষেপণ অবিধেয়। শকুনির অক্ষও দীর্ঘকাল সক্রিয় থাকে না, সেজন্য সে সানন্দে আপনার প্রস্তাবে সম্মত হবে। আপনার জয়ের পক্ষে তিনবার ক্ষেপণই যথেষ্ট। অক্ষ আমার সঙ্গেই আছে, পরীক্ষা ক'রে দেখুন।'

মংকুনি তাঁর কটিলগ্ন থলি থেকে একটি গজদন্তনির্মিত অক্ষ বার করলেন। যুধিষ্ঠির লক্ষ্য করলেন, অক্ষটি শকুনির অক্ষেরই অনুরূপ, তেমনই সুগঠিত সুমসৃণ, ধার এবং পৃষ্ঠগুলি ঈষৎ গোলাকার, প্রতি বিন্দুর কেন্দ্রে একটি সূক্ষ্ম ছিদ্র।

মংকুনি বললেন, 'মহারাজ, তিনবার ক্ষেপণ ক'রে দেখুন।'

যুধিষ্ঠির তাই করলেন, তিনবারই ছয় বিন্দু উঠল। তিনি আশ্চর্য হয়ে নেড়েচেড়ে দেখতে লাগলেন, কিন্তু মংকুনি ঝটিতি কেড়ে নিয়ে থলির ভিতর রেখে বললেন, 'এই মন্ত্রপূত অক্ষ অনর্থক নাড়াচাড়া নিষিদ্ধ, তাতে গুণহানি হয়।'

যুধিষ্ঠির বললেন, 'আপনার অক্ষটি নির্ভরযোগ্য বটে। কিন্তু এর পর আপনি যে বিশ্বসঘাতকতা করবেন না তার জন্য দায়ী কে?

'দায়ী আমার মুণ্ড। আপনি এখন থেকে আমাকে বন্দী ক'রে রাখুন, দুজন খড়্গপাণি প্রহরী নিরন্তর আমার

সঙ্গে থাকুক। তাদের আদেশ দিন - যদি আপনার পরাজয়ের সংবাদ আসে তবে তখনই আমার মুণ্ডচ্ছেদ করবে। মহারাজ, এখন আপনার বিশ্বাস হয়েছে ?'

'হয়েছে। কিন্তু শকুনির কূট পাশক যদি আমার কূটতর পাশকের দ্বারা পরাভূত হয় তবে তা ধর্মবিরুদ্ধ কপট দ্যূত হবে।'

'হায় হায় মহারাজ, এখনও আপনার কপটতার আতঙ্ক গেল না ! আপনারা দুজনেই তো যন্ত্রগর্ভ কূট পাশক নিয়ে খেলবেন, এতে কপটতা কোথায় ? মল্লযুদ্ধে যদি আপনার বাহুবল বিপক্ষের চেয়ে বেশী হয় তবে সেকি কপটতা ? যদি আপনার কৌশল বেশী থাকে সেকি কপটতা ? শকুনির পাশকে যে কূট কৌশল নিহিত আছে তা আমারই, আপনার পাশকে যে কূটতর কৌশল আছে তাও আমার। ধর্মরাজ, এই তৃতীয়দ্যূতসভায় বস্তুত আমিই উভয় পক্ষ, আপনি আর শকুনি নিমিত্তমাত্র।'

যুধিষ্ঠির বললেন, 'মৎকুনি, আপনার বক্তৃতা শুনে আমার মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে। ধর্মের গতি অতি সূক্ষ্ম, আমি কঠিন সমস্যায় পড়েছি। এক দিকে লোকক্ষয়কর নৃশংস যুদ্ধ, অন্য দিকে কূট দ্যূতক্রীড়া। দুইই আমার অবাঞ্ছিত, কিন্তু যুদ্ধের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করা যেমন রাজধর্মবিরুদ্ধ, সেইরূপ জ্যেষ্ঠতাতের আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করাও

আমার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। আপনার মন্ত্রণা আমি অগত্যা মেনে নিচ্ছি, আজই কুরুরাজের কাছে দূত পাঠাব। আপনি এখন থেকে সশস্ত্র প্রহরীর দ্বারা রক্ষিত হয়ে গুপ্তগৃহে বাস করবেন, কুরুপাণ্ডব কেউ আপনার খবর জানবে না। যদি জয়ী হই, আপনি গান্ধাররাজ্য পাবেন। যদি পরাজিত হই তবে আপনার মৃত্যু। এখন আপনার পাশকটি আমাকে দিন।'

'মহারাজ, আপনার কাছে পাশক থাকলে পরিচর্যার অভাবে তার গুণ নষ্ট হবে। আমার কাছেই এখন থাকুক, আমি তাতে নিয়ত মন্ত্রাধান করব এবং দ্যূতযাত্রার পূর্বে আপনাকে দেব। ইচ্ছা করেন তো আপনি প্রত্যহ একবার আমার কাছে এসে খেলে দেখতে পারেন।'

যুধিষ্ঠির বললেন, 'মৎকুনি, আপনার অতি তুচ্ছ জীবন আমার হাতে, কিন্তু আমার বুদ্ধি রাজ্য ধর্ম সমস্তই আপনার হাতে। আপনাব বশবর্তী হওয়া ভিন্ন আমার এখন অন্য গতি নেই।'

পরদিন যুধিষ্ঠির তাঁর ভ্রাতৃবৃন্দকে আসন্ন দ্যূতের কথা জানালেন। ধর্মরাজের এই বুদ্ধিভ্রংশের সংবাদে সকলেই কিয়ৎক্ষণ হতভম্ব হয়ে থাকবার পর তাঁকে যেসব

কথা বললেন তার বিবরণ অনাবশ্যক। যুধিষ্ঠির নিশ্চল হয়ে সমস্ত গঞ্জনা নীরবে শুনলেন, অবশেষে বললেন, 'ভ্রাতৃগণ, আমি তোমাদের জ্যেষ্ঠ, আমাকে তোমরা রাজা ব'লে থাক। অপরের বুদ্ধি না নিয়েও রাজা নিজের কর্তব্য স্থির করতে পারেন। যুদ্ধে অসংখ্য নরহত্যার চেয়ে দ্যূতসভায় ভাগ্যনির্ণয় আমি শ্রেয় মনে করি। জয় সম্বন্ধে আমি কেন নিঃসন্দেহ তার কারণ আমি এখন প্রকাশ করতে পারব না। যদি তোমরা আমার উপর নির্ভর করতে না পার তো স্পষ্ট বল, আমি কুরুরাজকে সংবাদ পাঠাব হে জ্যেষ্ঠতাত, আমি ভ্রাতৃগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত, তারা আমাকে পাণ্ডবপতি ব'লে মানে না, দ্যূতসভায় রাজ্যপণনের অধিকার আমার আর নেই, আমি অঙ্গীকারভঙ্গের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ অগ্নিপ্রবেশে প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছি, আপনি যথাকর্তব্য করবেন।'

তখন অর্জুন অগ্রজের পাদস্পর্শ ক'রে বললেন, 'পাণ্ডবপতি, আপনি প্রসন্ন হ'ন, আমাদের কটূক্তি মার্জনা করুন, আমাকে সর্ববিষয়ে আপনার অনুগত ব'লে জানবেন।'

তারপর ভীম নকুল সহদেবও যুধিষ্ঠিরের ক্ষমা ভিক্ষা করলেন। যুধিষ্ঠির সকলকে আশীর্বাদ ক'রে তাঁর গৃহে চলে গেলেন।

দ্রৌপদী এখন পর্যন্ত কোনও কথা বলেন নি। যে

মানুষ এমন নির্লজ্জ যে দু দু বার হেরে গিয়ে চূড়ান্ত দুঃখ-ভোগের পরেও আবার জুয়ো খেলতে চায় তাকে ভর্ৎসনা করা বৃথা। যুধিষ্ঠির চ'লে গেলে দ্রৌপদী সহদেবের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত ক'রে বললেন, 'ছোট আর্যপুত্র, হাঁ ক'রে দেখছ কি? ওঠ, এখনই দ্রুতগামী চতুরশ্বযোজিত রথে দ্বারকায় যাত্রা কর, বাসুদেবকে সব কথা ব'লে এখনই তাঁকে নিয়ে এস। তিনিই একমাত্র ভরসা, তোমরা পাঁচ ভাই তো পাঁচটি অপদার্থ জড়পিণ্ড।'

দশ দিনের মধ্যে কৃষ্ণকে নিয়ে সহদেব পাণ্ডবশিবিরে ফিরে এলেন। রথ থেকে নেমে কৃষ্ণ বললেন, দাদাও আসছেন।' যুধিষ্ঠিয় সহর্ষে বললেন, 'কি আনন্দ, কি আনন্দ! দ্রৌপদী অতি ভাগ্যবতী, তাঁর আহ্বানে কৃষ্ণ-বলরাম কেউ স্থির থাকতে পারেন না।'

ক্ষণকাল পরে দারুকের রথে বলরাম এসে পৌঁছলেন। রথ থেকেই অভিবাদন ক'রে বললেন, 'ধর্মরাজ, শুনলাম আপনারা উত্তম কৌতুকের আয়াজন করেছেন। কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ আমি দেখতে চাই না, কিন্তু আপনাদের খেলা দেখবার আমার প্রবল আগ্রহ। এখানে নামব না, আমরা দুই ভাই পাণ্ডবদের কাছে থাকলে পক্ষপাতের অপযশ হবে,

তা ছাড়া এখানে পানীয়ের ভাল ব্যবস্থা নেই। কৃষ্ণ এখানে থাকুন, আমি দুর্যোধনের আতিথ্য নেব। দ্যূতসভায় আবার দেখা হবে। চালাও দারুক।' এই ব'লে বলরাম কৌরবশিবিরে চ'লে গেলেন।

মহা সমারোহে দ্যূতসভা বসেছে। ধৃতরাষ্ট্র স্থির থাকতে পারেন নি, হস্তিনাপুর থেকে দুদিনের জন্য কৌরবশিবিরে এসেছেন, খেলার ফলাফল দেখে ফিরে যাবেন। শকুনির দক্ষতায় তাঁর অগাধ বিশ্বাস, কুরুপক্ষের জয় সম্বন্ধে তাঁর কিছুমাত্র সন্দেহ নেই।

সভায় কৃষ্ণবলরাম, পঞ্চপাণ্ডব, দুর্যোধনাদি সহ ধৃতরাষ্ট্র, শকুনি, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি সকলে উপস্থিত হ'লে পিতামহ ভীষ্ম বললেন, 'আমি এই দ্যূতসভার সম্যক্ নিন্দা করি। কিন্তু আমি কুরুরাজের ভৃত্য, সেজন্য অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই গর্হিত ব্যাপার দেখতে হবে।'

দ্রোণাচার্য বললেন, 'আমি তোমার সঙ্গে একমত।'

ভীষ্ম বললেন, 'মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, এই সভায় দ্যূতনীতি-বিরুদ্ধ কোনও কর্ম যাতে না হয় তার বিধান তোমার কর্তব্য। আমি প্রস্তাব করছি, শ্রীকৃষ্ণকে সভাপতি নিযুক্ত করা হ'ক।'

দুর্যোধন আপত্তি তুললেন, 'শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবপক্ষপাতী।'

কৃষ্ণ বললেন, 'কথাটা মিথ্যা নয়। আর, আমার অগ্রজ উপস্থিত থাকতে আমি সভাপতি হ'তে পারি না।'

তখন ধৃতরাষ্ট্র সর্বসম্মতিক্রমে বলরামকে সভাপতির পদে বরণ করলেন।

বলরাম বললেন, 'বিলম্বে প্রয়োজন কি, খেলা আরম্ভ হ'ক। হে সমবেত সুধীবৃন্দ, এই দ্যূতে কুরুপক্ষে শকুনি পাণ্ডবপক্ষে যুধিষ্ঠির নিজ নিজ একটিমাত্র অক্ষ নিয়ে খেলবেন। প্রত্যেকে তিনবার মাত্র অক্ষপাত করবেন। যাঁর বিন্দুসমষ্টি অধিক হবে তাঁরই জয়। এই দ্যূতের পণ সমগ্র কুরুপাণ্ডব রাজ্য। পরাজিত পক্ষ বিজয়ীকে রাজ্য সমর্পণ ক'রে এবং যুদ্ধের বাসনা পরিহার ক'রে সদলে চিরবনবাসী হবেন। সুবলনন্দন শকুনি, আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ, আপনিই প্রথম অক্ষপাত করুন।'

শকুনি সহাস্যে অক্ষ নিক্ষেপ ক'রে বললেন, 'এই জিতলাম।' তাঁর পাশাটি পতনমাত্র একটু গড়িয়ে গিয়ে স্থির হ'লে তাতে ছয় বিন্দু দেখা গেল। কর্ণ এবং দুর্যোধনাদি সোল্লাসে উচ্চৈঃস্বরে বললেন, 'আমাদের জয়।'

বলরাম বললেন, 'যুধিষ্ঠির, এইবার আপনি ফেলুন।'

যুধিষ্ঠিরের পাশা একবার ওলটাবার পর স্থির হ'লে

তাতেও ছয় বিন্দু উঠল। পাণ্ডবরা বললেন, 'ধর্মরাজের জয়।'

বলরাম বললেন, 'তোমরা অনর্থক চিৎকার করছ। কারও জয় হয় নি, দুই পক্ষই এখন পর্যন্ত সমান।'

শকুনি গম্ভীরবদনে বললেন, 'এখনও দুই ক্ষেপ বাকী, তাতেই জিতব।'

দ্বিতীয়বারে শকুনির পাশা আর গড়াল না, পড়েই স্থির হ'ল। পৃষ্ঠে পাঁচ বিন্দু। যুধিষ্ঠিরের পাশায় পূর্ববৎ ছয় বিন্দু উঠল। শকুনি লক্ষ্য করলেন তাঁর পাশাটি কাঁপছে।

পাণ্ডবপক্ষ আনন্দে গর্জন ক'রে উঠলেন। বলরাম ধমক দিয়ে বললেন, 'খবরদার, ফের চিৎকার করলেই সভা থেকে বার ক'রে দেব।'

সভা স্তব্ধ। শেষ অক্ষপাত দেখবার জন্য সকলেই শ্বাসরোধ ক'রে উদ্‌গ্রীব হয়ে রইলেন।

শকুনি পাংশুমুখে তৃতীয়বার পাশা ফেললেন। পাশাটি কর্দমপিণ্ডবৎ ধপ ক'রে পড়ল। এক বিন্দু।

যুধিষ্ঠিরের পাশায় আবার ছয় বিন্দু উঠল। বলরাম মেঘমন্দ্রস্বরে ঘোষণা করলেন, 'যুধিষ্ঠিরের জয়।'

তখন সভাস্থ সকলে সবিস্ময়ে দেখলেন, যুধিষ্ঠিরের

পতিত পাশা ধীরে ধীরে লাফিয়ে লাফিয়ে শকুনির পাশার দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

সভায় তুমুল কোলাহল উঠল, 'মায়া, মায়া, কুহক, ইন্দ্রজাল!'

দুর্যোধন হাত পা ছুড়ে বললেন, যুধিষ্ঠির নিকৃতি আশ্রয় করেছেন, তাঁর জয় আমরা মানি না। সাধু ব্যক্তির পাশা কখনও চ'লে বেড়ায়?

বলরাম বললেন, 'আমি দুই অক্ষই পরীক্ষা করব।'

যুধিষ্ঠির তখনই তাঁর পাশা তুলে নিয়ে বলরামকে দিলেন। শকুনি নিজের পাশাটি মুষ্টিবদ্ধ ক'রে বললেন, 'আমার অক্ষ কাকেও স্পর্শ করতে দেব না।'

বলরাম বললেন, 'আমি এই সভার অধ্যক্ষ, আমার আজ্ঞা অবশ্যপাল্য।'

শকুনি উত্তর দিলেন, 'আমি তোমার আজ্ঞাবহ নই।'

বলরাম কিঞ্চিৎ মত্ত অবস্থায় ছিলেন। তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে শকুনির গালে একটি চড় মেরে পাশা কেড়ে নিয়ে বললেন, 'হে সভ্যমণ্ডলী, আমি এই দুই অক্ষই ভেঙে দেখব ভিতরে কি আছে।' এই বলে তিনি শিলাবেদীর উপরে একে একে দুটি পাশা আছড়ে ফেললেন।

শকুনির পাশা থেকে একটি ঘুরঘুরে পোকা বার হ'য়ে নির্জীববৎ ধীরে ধীরে দাড়া নাড়তে লাগল। যুধিষ্ঠিরের

পাশা থেকে একটি ছোট টিকটিকি বেরিয়ে তখনই পোকাটিকে আক্রমণ করলে।

বাত্যাহত সাগরের ন্যায় সভা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। ধৃতরাষ্ট্র ব্যস্ত হয়ে জানতে চাইলেন, 'কি হয়েছে?'

বলরাম উত্তর দিলেন, 'বিশেষ কিছু হয় নি, একটি ঘুর্ঘুর কীট শকুনির অক্ষে ছিল।'

ধৃতরাষ্ট্র সভয়ে প্রশ্ন করলেন, 'কামড়ে দিয়েছে? কি ভয়ানক!'

'কামড়ায় নি মহারাজ, শকুনির অক্ষের মধ্যে ছিল। এই কীট অতি অবাধ্য, কিছুতেই কাত বা চিত হ'তে চায় না, অক্ষের ভিতর পুরে রাখলে অক্ষ সমেত উবুড় হয়। যুধিষ্ঠিরের অক্ষ থেকে একটি গোধিকা বেরিয়েছে। এই প্রাণী আরও দুর্ধর্ষ, স্বয়ং ব্রহ্মা একে কাত করতে পারেন না। গোধিকার গন্ধ পেয়ে ঘুর্ঘুর ভয়ে অবসন্ন হয়েছিল, তাই শকুনি অভীষ্ট ফল পান নি।'

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন, 'কার জয় হ'ল?

বলরাম বললেন, 'যুধিষ্ঠিরের। দুই পক্ষই কূট পাশক নিয়ে খেলেছেন, অতএব কপটতার আপত্তি চলে না। শুনেছি শকুনি অতি চতুর, কিন্তু এখন দেখছি যুধিষ্ঠির চতুরতর।'

যুধিষ্ঠির তখন জনান্তিকে বলরামকে মৎকুনির বৃত্তান্ত

জানালেন। বলরাম তাঁকে বললেন, 'ধর্মরাজ, আপনার কুণ্ঠার কিছুমাত্র কারণ নেই, কূট পাশকের ব্যবহার দ্যূতবিধিসম্মত।'

যুধিষ্ঠির পরম অবজ্ঞাভরে বললেন, হলধর, তুমি মহাবীর, কিন্তু শাস্ত্র কিছুই জান না। ভগবান্ মনু কি বলেছেন শোন

অপ্রাণিভির্যৎ ক্রিয়তে তল্লোকে দ্যূতমুচ্যতে।
প্রাণিভিঃ ক্রিয়তে যস্তু স বিজ্ঞেয়ঃ সমাহ্বয়ঃ॥

অর্থাৎ অপ্রাণী নিয়ে যে খেলা তাকেই লোকে দ্যূত বলে, আর প্রাণী নিয়ে খেলার নাম সমাহ্বয়। কুরুবাজ আমাকে অপ্রাণিক দ্যূতেই আমন্ত্রণ করেছেন, কিন্তু দুর্দৈববশে আমাদেব অক্ষ থেকে প্রাণী বেরিয়েছে। অতএব এই দ্যূত অসিদ্ধ।'

কর্ণ করতালি দিয়ে বললেন, 'ধর্মরাজ, তুমি সার্থকনামা।'

বলরাম বললেন, 'ধর্মরাজের শাস্ত্রজ্ঞান অগাধ, যদিও কাণ্ডজ্ঞানের কিঞ্চিৎ অভাব দেখা যায়। মেনে নিচ্ছি এই দ্যূত অসিদ্ধ। সেক্ষেত্রে পূর্বের দ্যূতও অসিদ্ধ, শকুনি তাতেও গুবুরগর্ভ অক্ষ নিয়ে খেলেছিলেন। কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্র, আপনার শ্যালকের অশাস্ত্রীয় আচরণের জন্য পাণ্ডবগণ বৃথা ত্রয়োদশ বর্ষ নির্বাসন ভোগ করেছেন। এখন তাঁদের

পিতৃরাজ্য ফিরিয়ে দিন, নতুবা পরকালে আপনার নরকভোগ অবশ্যম্ভাবী।'

যুধিষ্ঠির উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'আমি কোনও কথা শুনতে চাই না, দ্যূতপ্রসঙ্গে আমার ঘৃণা ধরে গেছে। আমরা যুদ্ধ করেই হৃতরাজ্য উদ্ধার করব। জ্যেষ্ঠতাত, প্রণাম, আমরা চললাম।'

তখন পাণ্ডবগণ মহা উৎসাহে বার বার সিংহনাদ করতে করতে নিজ শিবিরে যাত্রা করলেন। কৃষ্ণবলরামও তাঁদের সঙ্গে গেলেন।

ফিরে এসেই যুধিষ্ঠির বললেন, 'আমার প্রথম কর্তব্য মৎকুনিকে মুক্তি দেওয়া। এই হতভাগ্য মূর্খের সমস্ত উদ্যম ব্যর্থ হয়েছে। চল, তাকে আমরা প্রবোধ দিয়ে আসি।'

একটু আগেই পাণ্ডবশিবিরে সংবাদ এসে গেছে যে দ্যূতসভায় কি একটা প্রচণ্ড গোলযোগ হয়েছে। যুধিষ্ঠিরাদি যখন কারাগৃহে এলেন তখন দুই প্রহরী তর্ক করছিল—মৎকুনির মুণ্ডচ্ছেদ করা উচিত, না শুধু নাসাচ্ছেদেই আপাতত কর্তব্যপালন হবে।

যুধিষ্ঠিরের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে মৎকুনি মাথা

চাপড়ে বললেন, 'হা, দৈবই দেখছি সর্বত্র প্রবল। আমি গোধিকাকে বেশী খাইয়ে তার দেহে অত্যধিক বলাধান করেছি, তাই সেই কৃতঘ্ন জীব লম্ফঝম্ফ ক'রে আমার সর্বনাশ করেছে। বলদেব তবু সামলে নিয়েছিলেন, কিন্তু ধর্মরাজ শেষটায় শাস্ত্র আউড়ে সব মাটি ক'রে দিলেন। মুক্তি পেয়ে আমার লাভ কি, দুর্যোধন আমাকে নিশ্চয় হত্যা করবে।'

বলরাম বললেন, 'মৎকুনি, তোমার কোনও চিন্তা নেই, আমার সঙ্গে দ্বারকায় চল। সেখানে অহিংস সাধুগণের একটি আশ্রম আছে, তাতে অসংখ্য উৎকুণ-মৎকুণ-মশক-মূষিকাদির নিত্য সেবা হয়। তোমাকে তার অধ্যক্ষ ক'রে দেব, তুমি নব নব গবেষণায় সুখে কালযাপন করতে পারবে।'

১৩৫০